৩৯-৪০

বাংলাপিডিএফ

দস্যু বনহুর

ইরান সাগরে দস্যু বনহুর
দস্যু বনহুর ও রানী দুর্গেশ্বরী

রোমেনা আফাজ

রনি

ইরান সাগরে দস্যু বনহুর-৩৯
দস্যু বনহুর ও রাণী দুর্গেশ্বরী-৪০

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২, বাংলাবাজার
ঢাকা—১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪, বাংলাবাজার
ঢাকা—১১০০।

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

শিউরে উঠলো জীমস্ মীরা, সমস্ত সাগরতল যেন তোলপাড় হচ্ছে। একি হলো! কেন এমন হচ্ছে ভেবে পাচ্ছে না সে। কোথায়ই বা গেলো তার সেই অজানা বন্ধু, যে তাকে বলেছিল.....তোমাকে তোমার পিতার কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমাকে বাঁচতেই হবে জীমস্। কই, সে তো আর ফিরে এলো না। জীমস্ মীরা ভয়ে কাঁপছে, তার চারপাশে হাজার হাজার দানব যেন গর্জন করে ছুটে আসছে। নির্জন পাতাল-গহ্বরে সে আজ সম্পূর্ণ একা।

জীমস্ মীরা দু'হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠে—কে কোথায় আছো বাঁচাও.....

জীমস্ মীরার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি সাগরতলের ডুবন্ত পাহাড়ের পাথরে পাথরে আছাড় খেয়ে ফিরে আসে। কেউ নেই যে সাড়া দেবে তার ব্যাকুল আহ্বানে।

উচ্ছল জলরাশির ভয়ঙ্কর হুঙ্কার! কানে তালা লাগছে যেন। মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীটা যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে একাকার হয়ে ভেঙ্গে পড়বে তার মাথায়।

মিস জীমস্ মীরা যখন ডুবন্ত গুহার মধ্যে ভয়ে ছুটোছুটি করছে তখন বনহুরের সাবমেরিনখানা একটা ছোট্ট কুটোর মত তীরবেগে ছুটে চলেছে। কোন্ দিকে কোথায় চলেছে জানে না সে।

উত্তাল তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাতে মাঝে মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিলো বনহুরের সাবমেরিনটা। বনহুর শক্তভাবে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে বসে আছে, একটু এদিক ওদিক হলেই মৃত্যু!

বুঝতে পেরেছে বনহুর, তার রেখে আসা তিনটা ডিনামাইটে একসঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটেছে। নিশ্চয়ই কিউকিলার দেহটা ডুবন্ত পাহাড়ের টুকরার মত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে।

বনহুরের সন্দেহ সত্য—কিউকিলা যেমন তার গুহায় হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করছে অমনি তার হাঁটুর নিচে ডিনামাইট চাপা পড়ে বিস্ফোরণ

ঘটেছে। বনহুরের আলোকস্তম্ভের রশ্মি কিছু করতে না পারলেও ডিনামাইটের হাত থেকে কিছুতেই রক্ষা পেল না। পাহাড়ের টুকরার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটাও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়লো।

কিউকিলা প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু করলো মৃত্যু যন্ত্রণায়।

হঠাৎ ঝাম সাগরবক্ষে এই বিস্ফোরণ দৃষ্টিগোচর হলো ঝামবাসীদের। 'শাহী' জাহাজখানা তখন ঝাম বন্দরে নোঙ্গর করা ছিল, রহমান এবং বনহুরের অন্যান্য অনুচর এ সংবাদ পেয়ে বিস্মিত হলো। খবর পেয়ে ছুটে এলেন মহারাজ মোহন্ত সিন্ধু আর ঝাম সর্দার দলবল নিয়ে। মালাও পিতার সঙ্গে এসেছে, সবাই 'শাহী'তে চেপে কিছুদূর অগ্রসর হলো, একেবারে সাগরমধ্যে যাওয়ার সাহস কেউ পেল না। ক্যাপ্টেন বোরহান বললো—সমুদ্রগর্ভে হঠাৎ এমন বিস্ফোরণ ঘটলো; নিশ্চয়ই কোন আগ্নেয়গিরি থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে, কাজেই আর এগুনো উচিত হবে না।

ক্যাপ্টেনের কথায় সবাই নার্ভাস হয়ে পড়লো, এমন কি রহমান পর্যন্ত জাহাজ নিয়ে এগুতে সাহসী হলো না! কিন্তু রহমানের মনে এক ভীষণ সন্দেহের দোলা জাগলো। তার সর্দার যে ডিনামাইটগুলো নিয়ে সাগরতলে প্রবেশ করেছিল, সেগুলোই আজ সাগরগর্ভে বিস্ফোরণ ঘটেছে।

সবাই যখন সাগরবক্ষের উন্মত্ততা নিয়ে নানারকম আলাপ-আলোচনা করছে তখন রহমান আর মোহন্ত সিন্ধু চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে ডেকে দাঁড়িয়ে দূরে, বহুদূরে লক্ষ্য করছিল। সেদিনের পর থেকে সর্দারকে হারিয়ে তারা সর্বহারা হয়ে পড়েছে।

রহমানের চোখে ঘুম নেই, আহার-নিদ্রা যেন ভুলে গেছে সে। সর্দারকে ঝাম সাগরে চিরতরে বিসর্জন দিয়ে কি করে এই মুখ নিয়ে ফিরে যাবে! তাই সে ফিরে যায়নি, আজও রহমান বুকভরা আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে ঝাম সাগরে 'শাহী' নিয়ে প্রতীক্ষা করছে। সবাই জানে, তাদের সর্দার আর জীবিত নেই, তাকে কিউকিলা হত্যা করেছে। কিন্তু রহমানের মন যেন ডেকে বলছে, না সে মরেনি, মরতে পারে না।

হঠাৎ রহমানের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়লো দূরে, বহু দূরে পাহাড়ের মত জমকালো কিছু একটা বস্তু সমুদ্রজলে তোলপাড় করে একবার ডুবছে, একবার ভেসে উঠছে।

'শাহী' জাহাজ থেকে সবাই স্পষ্ট দেখতে লাগলো। বহুদূরের ব্যাপার হলেও প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে 'শাহী' জাহাজখানা দোল খেতে লাগলো। জাহাজের ডেকে স্থির হয়ে দাঁড়ানো যেন মুশকিল হয়ে পড়েছে।

রাজা মোহন্ত সিন্ধু, ঝাম সরদার, রহমান এবং অন্যান্য সকলে বিস্মিত হয়ে দেখছে ঐ বস্তুটা কি হতে পারে, তবে অনুমানে সবাই ধারণা করে নিলো, ওটা কিউকিলা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

রহমান 'শাহী' জাহাজের ক্যাপ্টেন বোরহানকে আদেশ দিলো জাহাজখানাকে আরও এগিয়ে নেবার জন্য।

তখন অবশ্য সেই জমকালো পর্বতসম বস্তুটা স্থির হয়ে এসেছে। বিপুল আগ্রহ নিয়ে সকলে অপেক্ষা করতে লাগলো, অল্পক্ষণেই তারা দেখতে পাবে সেই বস্তুটা।

রহমান এবং ক্যাপ্টেন বোরহান দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে লক্ষ্য করছে।

'শাহী' জাহাজখানা এবার গভীর সমুদ্র অভিমুখে এগুতে লাগলো। জাহাজ যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই জাহাজের যাত্রিগণ বিস্মিত হয়ে দেখতে পাচ্ছে, তাদের সম্মুখে একটি ডুবন্ত পাহাড় যেন ভাসমান অবস্থায় রয়েছে।

জমকালো পাহাড়টার দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছে 'শাহী' জাহাজ, ততই সকলের মনে আতঙ্ক আর আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। জাহাজে মালাও এসেছে পিতার সঙ্গে। সেও কুঁকড়ে গেছে ভয়ে, না জানি ওটা কি!

রহমান বললো—মহারাজ, ওটা কিউকিলার মৃতদেহ বলেই আমার সন্দেহ হচ্ছে এবং কিউকিলাকে সর্দারের ডিনামাইটই নিহত করতে সক্ষম হয়েছে।

রহমানের কথায় মহারাজের মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মালাও আনন্দধ্বনি করে বললো—দেবরাজ তাহলে বেঁচে আছে রহমানজী?

রহমানের মুখখানা কিন্তু খুশিতে দীপ্ত হয়নি, সে গম্ভীর ব্যথাভরা গলায় বললো—তিনি বেঁচে আছেন না মারা পড়েছেন এখন বলা মুশকিল।

বোরহান বললো—গভীর সাগরতলায় এতক্ষণ কারো বেঁচে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। ডুবুরী ড্রেসের অক্সিজেন পাইপে অক্সিজেন গ্রহণ করে

চব্বিশ ঘণ্টা কেউ বাঁচতে পারে—তার বেশি নয়। সর্দার প্রায় একশত চব্বিশ ঘণ্টা হলো সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করেছেন।

মালার মুখ কালো হয়ে উঠলো। একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় বুকটা তার কেঁপে উঠলো ভীষণভাবে। আজও মালা বিশ্বাস করতে পারছে না দেবরাজ আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। মালা তাকে ভালবেসেছিলো অন্তর দিয়ে।

জাহাজখানা একসময় জমকালো পর্বতসম ভাসমান বস্তুটার অতি নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হলো। সবাই যেন স্তব্ধ অবাক হয়ে পড়লো, বিরাট আকার বস্তুটা অন্য কিছু নয়—কিউকিলার বিশাল দেহ এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলো তারা।

রহমানের নির্দেশে জাহাজখানা আরও নিকটে নিয়ে যাওয়া হলো। কিউকিলাটা সম্পূর্ণ নীরব নিস্পন্দ হয়ে গেছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে একটু একটু দোল খাচ্ছে ভাসমান পর্বতের মত। যদিও তারা অনুমানে বুঝতে পারলো কিউকিলা জীবিত নেই—তবু সহসা কেউ সাহস পাচ্ছিলো না নিকটবর্তী হতে।

রহমান নিকটে পৌঁছে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলো কিউকিলার সমস্ত দেহটা ক্ষত-বিক্ষত মনে হচ্ছে যেন বিরাট একখানা লৌহদেহ থেতলে গেছে জাঁতাকলের চাপে।

রহমান তার সঙ্গীদের বললো—বড়ই আফসোস, কিউকিলাকে যে হত্যা করলো সে কোথায় এখন, জানি না সে জীবিত আছে কিনা। সর্দার কিউকিলার বাসস্থানে ডিনাইমাইট রেখে ফিরে আসতে চেষ্টা করছিল কিন্তু সে ফিরে আসতে পারেনি। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো, একটু থেমে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো আবার—কিউকিলাকে কোন শক্তি কাবু করতে সমর্থ হয়নি কিন্তু সর্দারের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। কিউকিলার সমস্ত দেহটা ডিনামাইটের আঘাতে থেতলে গেছে, তার সঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে কিউকিলার আবাসস্থল ডুবন্ত পাহাড়টা।

রহমানের কথাগুলো সম্পূর্ণ সত্য তাতে কোন ভুল নেই। রাজা মোহন্ত সিন্ধু এবং জাহাজ 'শাহীর' সকলে রহমানের কথাগুলো অবাক হয়ে শুনতে লাগলো।

এবার রহমানের আদেশে কিউকিলাটাকে তীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলে প্রস্তুত হলো। কিন্তু এতবড় জীব কিভাবে তীরে নেওয়া সম্ভব হবে।

রাজা মোহন্ত সিন্ধুর আনন্দ যেন ধরছে না, তাঁর রাজ্য আজ রাহুমুক্ত হয়েছে কম কথা নয়। হাজার হাজার ঝামবাসী নরনারীর জীবন রক্ষা পেল কিউকিলার কবল থেকে। কিন্তু তাঁর একটা দুঃখ যার জন্য আজ তারা বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেল সে নেই। বিশেষ করে মালাকে অর্পণ করার কথা ছিলো তারই হাতে।

মোহন্ত সিন্ধু আনন্দিত হয়ে সম্পূর্ণ খুশি হতে পারছিলো না। মালার মুখ বিষণ্ন মলিন হয়ে পড়েছে। সে পিতার উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছিলো কেন তিনি দেবরাজকে সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করতে অনুমতি দিয়েছিলো।

মোহন্ত সিন্ধু অনেক করে বুঝাতে লাগলেন—তাঁর কোন দোষ নেই, দেশবাসী এবং জনগণকে বিপদমুক্ত করার জন্যই তিনি এ কাজ করেছেন। মুখে যতই তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করুক কিন্তু তাঁর অন্তরটিও একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো, ডিনামাইট দিয়ে ঘুমন্ত পাহাড়টা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে তেমনি। মোহন্তসিন্ধুও যুবকটাকে ভালবেসে ফেলেছিল বিশেষ করে তার সুন্দর ব্যবহার আর সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

যতই ভাবুক আর সে ফিরে আসবে না, তাই নীরবে মালাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

ওদিকে রহমান দলবল নিয়ে কিউকিলাকে তীরের দিকে নেবার জন্য পরামর্শ শুরু করে দিলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করা চলবে না, কিউকিলার বিরাট দেহটা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো। জাহাজের বড় বড় রশি নামানো হলো। শুধু রশি নয় শিকল দিয়েও আটকাতে হবে কিউকিলার দেহটা।

রশি নামানো হলো, শিকল ঝুলিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু কিউকিলার দেহে সে রশি বা শিকল আটকাবে কে? কেউ সাহসী হচ্ছে না এ ব্যাপারে। মৃত কিউকিলাকেও ভয়াবহ বলেই মনে হচ্ছে তখনও।

শেষ পর্যন্ত রহমান আর তার সহকারী মাহবুব নিজেই কিউকিলার দেহের সঙ্গে শিকল আটকাতে মনস্থ করলো।

তারা ছোট লাইফবোট নামিয়ে নিল জাহাজ থেকে, তারপর দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লো বোটে। অতি নিকটেই কিউকিলার ভয়ঙ্কর ভীষণ আকার দেহটা। রহমানের সাহসী অন্তরটাও শিউরে উঠলো যেন।

কিউকিলার দেহটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। রহমান আর বিলম্ব না করে কিউকিলার হাতের সঙ্গে এবং পায়ের সঙ্গে মোটা রশি ও শিকল দিয়ে বেঁধে জাহাজের সঙ্গে আটকে ফেললো। তারপর জাহাজে ফিরে এলো রহমান ও মাহবুব।

জাহাজখানাকে তীরের দিকে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলো রহমান।

মস্তবড় 'শাহী' জাহাজ বিরাটদেহী কিউকিলাটাকে টেনে নিয়ে তীর অভিমুখে এগিয়ে চললো।

সংবাদ পেয়ে ঝাম অধিবাসিগণ সবাই এসে জড়ো হয়েছে ঝাম সমুদ্রতীরে। নর-নারী যুবক-বৃদ্ধ-অগণিত জনগণ সকলেরই চোখেমুখে যেমন বিস্মিত ভাব তেমনি আনন্দ-উচ্ছ্বাস। যে ভয়ঙ্কর জীবের ভয়ে তারা অহরহঃ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতো— দিনের শান্তি, রাত্রির ঘুম পালিয়ে গিয়েছিল তাদের জীবন থেকে, সেই জীবটা আজ নিহত হয়েছে। সবচেয়ে বড় আনন্দ—আজ তারা বিপদমুক্ত।

শহরের প্রত্যেকটা ব্যক্তি এসে জমায়েত হয়েছে, ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছে তারা, দেখতে চায় কেমন সে জীবটা যে তাদের এভাবে হত্যা করে চলেছিলো।

'শাহী' জাহাজখানা কিউকিলার পর্বতসম দেহটা নিয়ে ধীরে ধীরে তীর অভিমুখে এগিয়ে আসছে ঠিক যেন একটি জাহাজ আর একখানা ডুবন্ত জাহাজকে টেনে আনছে।

একসময় 'শাহী' তীরের অনতিদূরে এসে পৌঁছেছে।

কিন্তু কিউকিলার বিরাট দেহটা একেবারে তীরের সন্নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হলো না, আটকে গেলো গভীর জলের মধ্যে।

রহমান কিন্তু ক্ষান্ত হলো না অন্যান্য অনুচরসহ কিউকিলার দেহটাকে তীরের নিকটে আনতে নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। অনেক করে তবেই তার কিছুটা আনতে পারলো। এখন কিউকিলার সম্পূর্ণ দেহটাই প্রায় পানির উপরে জেগে আছে। এবার লোকজন সবাই মৃত কিউকিলাকে দেখার জন্য

ছোট ছোট নৌকাযোগে তীর ছেড়ে সমুদ্রে নেমে পড়লো। কেউবা মোটর বোট নিয়ে কেউবা স্পীড বোট নিয়ে। সকলেই মনে বিপুল আগ্রহ— এবার তারা জীবনটাকে ভালভাবে দেখতে পাবে।

যারা এখনও মৃত কিউকিলাকে দেখে ভয় পাচ্ছিলো তারা চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখতে লাগলো।

রহমান কয়েকজনকে নিয়ে কিউকিলাটাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। তাদের সঙ্গে ছিলো ঝাম বৈজ্ঞানিক রাসেল। মৃত কিউকিলাটিকে পরীক্ষা করে তিনি জানালেন, একমাত্র ডিনামাইট বিস্ফোরণেই এই ভয়ঙ্কর জীবটার মৃত্যু ঘটেছে। রাসেল আরও বলেন—কিউকিলার দেহের চামড়া এত পুরু যে গণ্ডারের চামড়ার চেয়েও শত শত গুণ শক্ত ও কঠিন —যে চামড়া আলোকরশ্মির তীব্র তাপেও দগ্ধীভূত হয়নি। তবে রহমান এবং অন্যান্য সকলে দেখলো, কিউকিলার মৃতদেহের মুখ আর দেহের স্থানে স্থানে ঝলসানো।

রাসেল বললেন—কিউকিলার দেহে যে অগ্নি ঝলসানো স্থান দেখা যাচ্ছে, এগুলো আলোকরশ্মি স্তম্ভের সাংঘাতিক রশ্মি দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

কিউকিলার মৃতদেহ নিয়ে ঝাম শহরে যখন মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে তখন গভীর সমুদ্রতলে দস্যু বনহুর সাবমেরীনসম যান নিয়ে জীম্‌স মীরার সন্ধানে ডুবন্ত পর্বত গুহায় অন্বেষণ করে ফিরছে। সমুদ্রতলে জলোচ্ছ্বাসের ভীষণ আঘাতে জলযানটা ছিটকে পড়েছে অনেক দূরে কয়েক মাইল তফাতে।

হাঙ্গর, কুমীর, তিমি আরও অসংখ্য সামুদ্রিক জলজীবের পাশ কেটে তীর বেগে ছুটে চলেছে বনহুরের জলযানটা। এখন অবশ্য স্পীড কমে আসছে অনেক কারণ তাকে গভীর জলের তলায় পথ অন্বেষণ করে নিতে হচ্ছে। জীম্‌স মীরাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত সে শান্তি পাচ্ছে না। কিন্তু এখনও সেই স্থান নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে।

সমুদ্রতল শুষ্ক পৃথিবীর মত স্পষ্ট নয়। ঘোলাটে জলের মধ্যে চারদিকে নানারকম জলীয় উদ্ভিদের আড়ালে কোথায় যে জীম্‌স মীরার আবাসস্থান খুঁজে পাওয়া সহজ কথা নয়।

অনেক সন্ধান করার পর বনহুর হঠাৎ তার পরিচিত ডুবন্ত গুহাটা আবিষ্কারে সক্ষম হলো। জীম্‌স মীরা যে গুহায় আবদ্ধ রয়েছে, বনহুর তার জলযান নিয়ে কৌশলে প্রবেশ করলো সেই গুহার মুখে। তারপর মেশিনে চাপ দিতেই সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো। বনহুর জলযান রেখে সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলো।

অল্পক্ষণে বনহুর জীম্‌স মীরার গুহায় প্রবেশ করলো বটে কিন্তু কোথায় জীম্‌স মীরা। বনহুর পর পর সবগুলো গুহা সন্ধান করে ফিরলো, নাম ধরে ডাকতে লাগলো—জীম্‌স মীরা! জীম্‌স মীরা—তুমি কোথায়?

কিন্তু কোনো জবাব এলো না।

বনহুর চিন্তিত হয়ে পড়লো। সাবমেরিনে যে পোশাক পরেছিল সে পোশাক খুলে ফেললো বনহুর। ভিতরে অক্সিজেন দিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গুহাগুলো তৈরি কাজেই বনহুরের কোন অসুবিধা হলো না।

বনহুর গুহা-সংলগ্ন বাথরুমে প্রবেশ করলো। হঠাৎ নজরে পড়লো, জীম্‌স মীরার সংজ্ঞাহীন দেহ পড়ে আছে বাথরুমের মেঝেতে।

বনহুর তাড়াতাড়ি জীম্‌স মীরার হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে পালস্ পরীক্ষা করে দেখলো—না, তার তেমন কিছু হয়নি। বুঝতে পারলো ভয়ে বা আতঙ্কে তার এ অবস্থা হয়েছে।

এবার বনহুর জীম্‌স মীরার সংজ্ঞাহীন দেহটা হাতের উপরে তুলে নিল তারপর নিয়ে এলো নিজের গুহায়। শয্যায় শুইয়ে দিলো যত্নসহকারে। গুহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা ছিল। আলোতে বনহুর দেখলো জীম্‌স মীরার কপালে একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। পড়ে গিয়ে মেঝের পাথরে আঘাত লেগে ক্ষতটা হয়েছে নিশ্চয়ই।

বনহুর একটা রুমাল দিয়ে কপালটা বেঁধে দিলো যত্ন করে। কিছুক্ষণ পর অবশ্য জ্ঞান ফিরে এলো জীম্‌স মীরার। চোখ মেলে চাইতেই বনহুরকে দেখতে পেয়ে খুশি হলো সে, চোখ দুটো আনন্দে চক্‌চক্ করে উঠলো।

বনহুরের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বললো—ফিরে এসেছো তুমি? সত্যি আমি বড় দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমার কি হয়েছিলো?

হেসে বললো বনহুর—ফিরে এসে তোমাকে না দেখে আমিও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। তুমি বাথরুমের মেঝেতে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিলে।

আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম তাহলে?

হাঁ জীম্‌স মীরা।

জীম্‌স মীরার চোখেমুখে একটা ভীতিকর ভাব ফুটে উঠলো, বললো সে—কি ভয়ঙ্কর গর্জন! আমার মনে হচ্ছিলো চারদিক থেকে হাজার হাজার রাক্ষস ছুটে আসছে আমাকে গ্রাস করতে তাই আমি সহ্য করতে পারিনি।

জীম্‌স মীরা তুমি শুনে খুশি হবে আমি জলদানবটাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি।

কথাটা শুনামাত্র জীম্‌স মীরা আনন্দে উচ্ছল হয়ে জড়িয়ে ধরলো বনহুরের গলা, বনহুরের গণ্ডে চুম্বন দিয়ে বললো—সত্যি তুমি বীর পুরুষ।

বনহুর জীম্‌স মীরার এই আচরণে একটু বিব্রত বোধ করলো। কিন্তু পারলো না সে জীম্‌স মীরার হাত দু'খানাকে খুলে দিতে নিজের কণ্ঠ থেকে, বরং বনহুরের বাহু দুটি জীম্‌স মীরার কোমল দেহটাকে গভীর আলিঙ্গনে টেনে নিলো কাছে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। বনহুর জীম্‌স মীরাকে বাহুমুক্ত করে দিয়ে বললো—জীম্‌স মীরা, এখানে বিলম্ব করা যায় না, এবার চলো তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বাবার কথা মনে হতেই জীম্‌স মীরার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। একটা করুণ বিষণ্ন ভাব নেমে এলো তার মুখে, বললো জীম্‌স মীরা—আমার বাবা কি এতোদিন বেঁচে আছেন। নিশ্চয়ই তিনি মারা গেছেন। যা অত্যাচার করেছিলো ওরা বাবার উপর।

বনহুর জীম্‌স মীরাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—মিছামিছি মন খারাপ করছো মীরা, তোমার বাবা নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন। আমি তোমার বাবার সন্ধান করে তাঁকে খুঁজে বের করবো এবং তাঁর নিকট তোমাকে পৌঁছে দেবো।

জীম্‌স মীরা মাথা নিচু করে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—দাঁড়াও আমি তোমাকে রত্নদ্বীপের একটা ম্যাপ এনে দিচ্ছি, এতে তোমার সুবিধা হতে পারে।

বনহুর খুশি হলো, এ ধরনের একটা ম্যাপ পেলে তার পক্ষে সুবিধা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জীম্‌স মীরা জ্যাম্‌স বাবার গুপ্ত গুহায় প্রবেশ করলো, তারপর একটা পাথর সরিয়ে ফেললো।

বনহুরও গিয়েছিলো জীম্‌স মীরার সঙ্গে। অবাক হয়ে দেখলো—জীম্‌স মীরা গুহার পাথরে চাকার মত একটা কিছুতে চাপ দিতেই একটা পাথর সরে গেলো, ভিতরে সুন্দর একটি সুড়ঙ্গপথ।

জীম্‌স মীরা বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—এসো আমার সঙ্গে।

বনহুর বিনা দ্বিধায় তার সঙ্গে সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলো। বনহুর আরও বেশি অবাক হলো সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করতেই পাথরের দেয়ালটা বন্ধ হয়ে গেলো আপনা আপনি। আরও লক্ষ্য করলো সে, সুড়ঙ্গমধ্যে সুন্দর আলো আর অক্সিজেনের ব্যবস্থা আছে।

বনহুর জীম্‌স মীরার পিছনে পিছনে এগিয়ে চললো বটে কিন্তু দৃষ্টি তার চারদিকে ঘুরে ফিরতে লাগলো—একি অদ্ভুত কাণ্ড! গভীর সাগরগর্ভে এত সুন্দরভাবে কি করে আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল জ্যাম্‌স বাবা?

জীম্‌স মীরা বনহুরের বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করে হেসে বললো —এসব দেখে তুমি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছো, তাই না?

হ্যাঁ মীরা, তোমার জ্যাম্‌স বাবার অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশল দেখে আমি সত্যি অবাক হচ্ছি, গভীর সাগরতলে কি করে সে এমনভাবে বৈদ্যুতিক আলো আর সুন্দর হাওয়ার সৃষ্টি করেছে।

জীম্‌স চলতে চলতে থেমে পড়লো, তারপর বললো—ঐ শয়তান জ্যাম্‌স যেমন শক্তিতে ভয়ঙ্কর ছিলো তেমনি বুদ্ধিতে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সে গভীর সাগরতলে—তার এই গুপ্ত আবাস স্থল তৈরি করে নিয়েছে। পৃথিবীর লোক যেন তার সন্ধান না পায়। ম্যানচেষ্টার ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টোরেজ কর্তৃক প্রস্তুত ডায়নামার সাহায্যে সে এই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমাকে সেই অদ্ভুত ডায়নামাটাও দেখাবো।

জীম্‌স মীরার কথায় বনহুর অত্যন্ত খুশি হলো।

জীম্‌স মীরা এবার আরও কিছুটা এগিয়ে গেলো। সম্মুখে একটি গোলাকার বল ঝুলছে সেই বলটার দিকে তাকিয়ে বললো জীম্‌স—ফ্রেণ্ড, এটা হলো একটা চাবি। এই বল ধরে খুব জোরে টান দিলে ছাদের পাথর

সরে যাবে, বেরিয়ে আসবে একটি সিঁড়ি পথ। সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলে একটি ক্ষুদ্র গুহা আছে—তারই মধ্যে আছে সেই রত্নদ্বীপের ম্যাপ—যে ম্যাপখানা আমার বাবার নিকট থেকে সে সব শুনে তৈরি করে নিয়েছিলো।

বনহুর কিছু বলার পূর্বেই জীম্‌স মীরা সম্মুখস্থ ঝুলন্ত বলটা ধরে খুব জোরে টান দিলো। সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে নেমে এলো একটি ঝুলন্ত সিঁড়িপথ।

জীম্‌স মীরার পিছনে বনহুর যেমন সেই ঝুলন্ত সিঁড়িপথে পা রাখতে যাবে অমনি আড়াল থেকে কে যেন আচম্বিতে লাফিয়ে পড়লো বনহুরের ঘাড়ের উপর। অমনি বনহুর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে। জীম্‌স মীরা ঝুলন্ত সিঁড়ি থেকেই ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠলো—জ্যাম্‌স বাবা।

বনহুর পড়ে গিয়েই উঠে দাঁড়াতে গেলো, কিন্তু ততক্ষণে দু'খানা ভয়ঙ্কর হাত তার গলা টিপে ধরেছে। বনহুর দেখলো এ যে তার হস্তে নিহত জ্যাম্‌স বাবা। তবে জ্যাম্‌স বাবার মৃত্যু ঘটেনি তার ছোরার আঘাতে?

জ্যাম্‌স বাবার হাতের চাপে বনহুর চোখে সর্ষে ফুল দেখলেও আরও নজরে ছিলো জ্যাম্‌স বাবার বুকের জামাটার দক্ষিণ অংশে জমটো রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে! চোখ দুটো শার্দুলের চোখের মত হিংস্র, আগুনের মত জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

বনহুর প্রস্তুত ছিলো না, তাই জ্যাম্‌স বাবা তাকে ভীষণভাবে কাবু করে ফেলতে সক্ষম হলো। বনহুর এবং জীম্‌স জানতো এই অদ্ভুত ডুবন্ত গুহায় এখন তারাই দু'টি প্রাণী মাত্র রয়েছে। বনহুর সবাইকে এক এক করে হত্যা করেছে নিজের হাতে—তাই সে ছিলো নিশ্চিন্ত। কিন্তু বনহুর যদি সেই গুহায় পরে প্রবেশ করতো তাহলে দেখতে পেত জ্যাম্‌স বাবার মৃতদেহটা সেই স্থানে নেই।

বনহুর মরিয়া হয়ে নিজকে রক্ষা করা চেষ্টা করতে লাগলো। একবার পকেটে হাত দিতে পারলে সে তার ক্ষুদে পিস্তলটা বের করে নিতে পারতো। তাহলে সে দেখে নিত জ্যাম্‌স রাক্ষসটাকে। বনহুরের খেয়াল আছে, ছোরাখানা সমূলে বিদ্ধ হয়েছিল তার ডান পাশের পাঁজরে। কিন্তু কি করে তার জীবন রক্ষা পেল। জ্যাম্‌স বাবার বুকের সেই রক্তস্রোত এখনও স্পষ্ট

চোখের সামনে ভাসছে। সেই তীব্র আর্তনাদের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কানের কাছে-------আঃ আঃ উঃ------

জ্যাম্‌স বাবা যখন বনহুরের গলা দু'হাতে চেপে ধরলো তখন তার চোখ দুটো ঠিকরে যেন বেরিয়ে আসছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেন। বনহুর নিজের হাত দু'খানা দিয়ে লৌহ সাঁড়াশীর মত জ্যাম্‌স বাবার হাত দু'খানা ছাড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করলো। এত শক্তি জ্যাম্‌স বাবার আগে বুঝতে পারেনি বনহুর। নিচে পড়ে সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো, কোনো ক্রমে একবার দাঁড়াতে পারলেই হয়।

বনহুরকে যখন জ্যাম্‌স বাবা আচমকা আক্রমণ করে বসেছিল তখন জীম্‌স মীরা ভীষণভাবে চমকে উঠেছিলো, সে ভাবতেও পারেনি জ্যামস বাবা জীবিত আছে বা ছিলো। ভূত দেখার মতই আরষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

প্রথমে কোন কথাই জীম্‌স মীরার মুখ দিয়ে বের হলো না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো ঝুলন্ত সিঁড়িটার উপর। সম্বিৎহারার মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো সব। এবার হুশ হলো—সর্বনাশ! জ্যাম্‌স বাবা তো তার বন্ধুকে হত্যা করে ফেললো এখন উপায়!

জীম্‌স মুহূর্ত বিলম্ব না করে ওদিকে পড়ে থাকা একটা লৌহ রড দিয়ে ভীষণ জোরে তার মাথায় আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে জ্যামস বাবার হাত দু'খানা অবশ হয়ে ছিলো। দেহটা ঢলে পড়লো বনহুরের পাশে।

বনহুর দ্রুত উঠে দাঁড়ালো, এবং পকেট থেকে বের করে নিলো তার ক্ষুদে মারাত্মক আগ্নেয় অস্ত্রখানা। বনহুর ভেবেছিলো, সঙ্গে সঙ্গে জ্যাম্‌স উঠে আবার তাকে আক্রমণ করবে কিন্তু করলো না। কারণ জ্যাম্‌স লৌহ রডের আঘাতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো।

জীম্‌স মীরার হস্তে তখনও লৌহ রডখানা ধরা রয়েছে। সে জ্যামস্ বাবার মাথায় পুনরায় আঘাত করার জন্য লৌহ রডটা উঁচু করতেই বনহুর ধরে ফেললো।

জীমস্ মীরা অবাক হয়ে তাকালো, বললো—ওকে শেষ করতে দাও!

বনহুর বললো—না।

কেন?

ওর বুকে ছোরা বসিয়ে আমি ভুল করেছিলাম জীম্‌স। ভাগ্যিস ওর মৃত্যু হয়নি।

বনহুরের কথায় জীম্‌স মীরার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। স্থির দৃষ্টি মেলে তাকায় সে বনহুরের মুখের দিকে।

বুঝতে পারে বনহুর জীম্‌স মীরার মনোভাব বলে—জ্যাম্‌স বাবাকে আমার নিতান্ত প্রয়োজন।

জীম্‌স আংগুল দিয়ে ভুলুণ্ঠিত জ্যাম্‌স বাবাকে দেখিয়ে দিয়ে বলে—ফ্রেণ্ড তুমি ঐ শয়তানটাকে প্রয়োজন মনে করছো?

হ্যাঁ জীম্‌স।

কিন্তু সে তোমাকে হত্যা করার জন্য ভীষণ উদ্‌গ্রীব এটা তুমি ভুলে গেছো?

মোটেই না।

তবুও ওকে তোমার প্রয়োজন?

হ্যাঁ। জীম্‌স ওর জ্ঞান ফিরতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। তুমি এক কাজ করো শীঘ্র ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাও এবং রত্নদ্বীপের ম্যাপখানা নিয়ে এসো। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

জীম্‌স মুহূর্ত বিলম্ব না করে উপরে উঠে যায়।

বনহুর লক্ষ্য করতে লাগলো ভূপতিত জ্যাম্‌স বাবাকে—কি ভয়ঙ্কর আর বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে। বুকের পাশে ক্ষত দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে। বনহুর বুঝতে পারে, তার ছোরাখানা জ্যাম্‌সের বুকে বিদ্ধ হলেও তার হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসে আঘাত লাগেনি বা পাঁজরের কোন হাড় ফেটে যায়নি। বিশাল দেহের মাংসপেশীটাই ভেদ করে গিয়েছিলো মাত্র।

বনহুর জ্যাম্‌সের মাথায় লৌহ রডের আঘাতটার পাশে হাত দিয়ে দেখলো মাথায় অনেক বড় একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। বনহুর দক্ষিণ হস্তে পিস্তল ঠিক রেখে বাম হস্তে জ্যামের মাথাটায় ঝাঁকুনি দিয়ে জ্ঞান ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু মাথার আঘাতটা অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় সহসা জ্যাম্‌সের জ্ঞান ফিরে আসবে বলে মনে হলো না তার। উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলো বনহুর।

অল্পক্ষণ পর ফিরে এলো জীম্‌স মীরা, হাতে তার একখানা চামড়ার প্যাকেট। বনহুরের হাতে প্যাকেটটা গুঁজে দিয়ে বললো জীম্‌স মীরা—ফ্রেণ্ড তুমি শীঘ্র এটা দেখে নাও ওর জ্ঞান ফিরার পূর্বেই আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।

বনহুর জীম্‌স মীরার হাত থেকে চামড়ার প্যাকেটটা নিয়ে বললো—ওকেও যে সঙ্গে নিতে হবে জীম্‌স।

বলো কি। জীম্‌স মীরা যেন কেঁপে উঠলো বেতসপত্রের মত থরথর করে।

বনহুর ম্যাপখানা পকেট থেকে বের করে মেলে ধরলো, চামড়ার উপরে জমকালো কালি দিয়ে সুন্দরভাবে ম্যাপখানা আঁকা রয়েছে।

জীম্‌স বুঝিয়ে দিলো—সমুদ্রতলে কোন্ পথে কোন্‌দিকে গেলে ইরান সাগর পাওয়া যাবে। ম্যাপে সব স্পষ্টভাবে আঁকা আছে কাজেই কোন অসুবিধা হবে না।

বনহুর কিছুক্ষণ মনোযোগ সহকারে ম্যাপটা দেখে নেয়, তারপর বলে—যতক্ষণ জ্যাম্‌সের সংজ্ঞা ফিরে না আসে ততক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

অভিমান এবং ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো জীম্‌স—তুমি বড্ড বুদ্ধিহীনের মত কথা বলছো বন্ধু। জ্যাম্‌স বাবার জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে পুনরায় তোমাকে আক্রমণ করবে।

কিন্তু আমি তাকে সে সুযোগ দেবো না জীম্‌স।

তাতো বুঝলাম, তোমার পিস্তল তাকে হত্যা করার পূর্বে সে অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারে। তার চেয়ে বলো, আমি ওকে শেষ করে দেই?---

এমন সময় নড়ে উঠলো জ্যাম্‌স বাবা।

বনহুর তার দেহ থেকে সব কিছু অস্ত্র সার্চ করে নিয়েছিলো, জ্যাম্‌স উঠে বসতেই তার বুকের কাছে পিস্তল চেপে ধরে বললো—কিছুক্ষণ ক্ষান্ত হয়ে বসে থাকে।

জ্যাম্‌স ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো একবার বনহুরের মুখে।

বনহুর বললো—কোনোরকম শয়তানি করলে তোমাকে এবার সত্য সত্য মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমার পিস্তলে পাঁচ পাঁচটি গুলী আছে। আমি তোমাকে পাঁচটি গুলীই উপহার দেবো।

জ্যাম্‌স দক্ষিণ হাত দিয়ে নিজের মাথাটা একবার নেড়ে নিল হয়তো বা জ্যাম্‌স মীরার লৌহ রডের আঘাতটা টন্‌টন্ করছিলো। হাত বুলিয়ে ব্যথাটাকে হাল্‌কা করে নেবার চেষ্টা করলো বোধ হয় সে।

জীম্‌স মীরার মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। জ্যাম্‌স বাবা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকালো জীম্‌সের দিকে। মনোভাব—তোমার জন্যই আজ আমার সর্বনাশ হয়েছে।

বনহুর ওকে বেশিক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগ না দিয়ে বললো—উঠো এবার!

বিরাট গরিলা দেহের মত গড়িয়ে গড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো জ্যাম্‌স বাবা! মুখোভাব ক্রোধান্ধ হলেও ব্যথাকাতরও বটে। বনহুরের ছোরা তার হৃৎপিণ্ড ছেঁদ না করলেও আঘাতটা কম ছিলো না। এখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে জমাটবাঁধা রক্তের গা বেয়ে বেয়ে! উঠে দাঁড়িয়ে টলতে লাগলো জ্যাম্‌স বাবা।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বললো—চলতে পারবে এখন?

অগ্নিগোলার মত চোখ দুটো তুলে তাকালো জ্যাম্‌স বাবা বনহুরের মুখের দিকে। কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর এক মুহূর্তের জন্যও ক্ষুদে পিস্তলখানাকে তার বুকের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়নি। পিস্তল ঠিক রেখে সে কথা বলছিলো; কারণ বনহুর জানে, জ্যাম্‌স বাবা কতখানি সাংঘাতিক আর অসুরের মত শক্তিবান। জীম্‌স মীরা না থাকলে আজ তাকে হয়তো হত্যা না করে ছাড়তো না এই শয়তানটা।

যাক্ বেশিক্ষণ কিছু ভাবার সময় নেই এখন, বনহুর পিস্তল জ্যাম্‌স বাবার বুকে চেপে ধরে বলে—চলো আমার সঙ্গে।

জ্যাম্‌স এবার কথা বললো—কোথায় যাবো?

রত্নদ্বীপে। বললো বনহুর।

জ্যাম্‌স বাবার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো। তারপর যেন ছাই বর্ণ হয়ে গেলো, বললো— রত্নদ্বীপের সন্ধান তোমাকে কে বললো?

জীমস মীরা যদিও জ্যাম্‌স বাবাকে ভীষণ ভয় করছিলো কিন্তু এক্ষণে সে যেন সাহসী হয়ে উঠলো, বললো—আমি—আমিই ওকে রত্নদ্বীপের সন্ধান বলেছি—শুধু তাই নয়, ঐ দেখো ওর বাম হস্তে তাকিয়ে রত্নদ্বীপের ম্যাপখানাও আমি ওকে দিয়েছি।

জ্যামস বাবা বনহুরের হাতের দিকে তাকাতেই তার মুখ বিকৃত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো, ভুলে গেলো পিস্তলের কথা সে বনহুরের হাত থেকে ম্যাপখানা কেড়ে নিতে যাচ্ছিলো।

বনহুর দৃঢ়কণ্ঠে বললো—ভুলে যেও না জ্যাম্‌স তোমার বুকের কাছে যমদূত রয়েছে।

সত্যিই জ্যাম্‌স বিস্মৃত হয়েছিলো পিস্তলের কথাটা, ঝুঁকে সে হাত বাড়াতে যাচ্ছিলো বনহুরের বাম হস্তের দিকে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলো জ্যাম্‌স তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

বনহুর বললো— রত্নদ্বীপে পৌঁছে রত্নদ্বীপের ম্যাপখানা তোমাকে ফেরৎ দেবো জ্যাম্‌স ভয় পেও না।

জ্যাম্‌স রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো।

বনহুর বললো— চলো আমার সঙ্গে।

পিস্তলের সম্মুখভাগ দিয়ে জ্যামসের বুকে ঠেলা দিয়ে তার মুখখানা গুহার দরজার দিকে ফিরিয়ে নিলো তারপর পিস্তলখানা ওর পিঠে চেপে ধরে বললো—পা চালাও।

জ্যাম্‌স অগ্রসর হলো।

বনহুর বললো—এস জীম্‌স।

বনহুর জ্যাম্‌স বাবা ও জীম্‌স মীরাসহ ডুবন্ত পাহাড়ের শেষ গুহার মুখে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর নিজে ডুবুরী ড্রেস পরে নিলো এবং মীরাকে পরার জন্য নির্দেশ দিলো। জ্যাম্‌স বাবাকেও পরিয়ে দিলো তার জলযান চালকের অদ্ভুত ড্রেস।

এবার বনহুর জ্যাম্‌স বাবা ও জীম্‌স মীরাসহ গোলাকার জন্তু আকার জলযানটার মধ্যে চেপে বসলো। কিন্তু বনহুর কোনো সময়ের জন্যও জ্যামস বাবার পিঠ থেকে পিস্তলটা সরিয়ে নিলো না।

জ্যাম্‌সকে জলযানের ড্রাইভ আসনে বসিয়ে বনহুর নিজে বসলো তার পাশে। জীম্‌স মীরা পিছনের আসনে বসলো। বনহুরের পিস্তল তখনও জ্যাম্‌স বাবার পাঁজরে চেপে আছে শক্ত হয়ে। বনহুরের বাম হস্তের ম্যাপে ঝাম ম্যাপ সাগর থেকে ইরান সাগরের পথের নির্দেশ দেওয়া আছে; আরও আছে সাগরতলে রত্নদ্বীপের অবস্থান চিহ্ন।

জ্যাম্‌স বাবা অগত্য জলযানটার মেশিন স্টার্ট দিল। গভীর জলের তলায় বিকট একটা শব্দ করে তীরবেগে ছুটলো জলযানটা।

বনহুর এক মুহূর্তের জন্য জ্যাম্‌স বাবার পাঁজর থেকে ভুলক্রমেও পিস্তল সরিয়ে নিল না। দৃষ্টি রইলো তার হাতের দিকে সর্বক্ষণ।

জীম্‌স মীরাও নিপুণ দৃষ্টি রেখেছে জ্যাম্‌স বাবার দিকে।

জলযান তীরবেগে ছুটে চলেছে।

বনহুর শুধু জ্যাম্‌স বাবার উপরই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে তা নয়, অদ্ভুত গোলাকার জন্তুর মত জলযানটি কিভাবে সে চালনা করছে সেটাও বনহুর সূক্ষ্মভাবে দেখে নিচ্ছিলো।

বনহুরের বাম উরুর উপরে ঝাম সাগর হতে ইরান সাগরে যাওয়ার পথ নির্দেশের ম্যাপখানা মোলানো অবস্থায় রয়েছে। জলযানটার ভিতরে সম্মুখভাবে মিটার এবং দিকদর্শন যন্ত্র আঁটা রয়েছে। জ্যাম্‌স বাবা ভুলপথে চালনা করলেই ধরা পড়ে যাবে সে বনহুরের হাতে।

বনহুর সাবধান করে দিচ্ছে মাঝে মাঝে—খবরদার একটু পথ ভুল করেছো অমনি মরেছো মনে রাখবে।

জ্যাম্‌স কত ভাগ্যে তার হারানো জীবনটা ফিরে পেয়েছে কাজেই সে সহসা জলযানটা ভুলপথে নিয়ে যেতে সাহসী হচ্ছিলো না! কিন্তু অত্যন্ত রক্তক্ষয়ে ক্রমান্বয়ে জ্যাম্‌স ঝিমিয়ে পড়ছিলো।

জীম্‌স মীরা বুঝতে না পারলেও বুঝতে পেরেছিল বনহুর, সে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারছিলো না জ্যাম্‌স বাবার উপর। কারণ যে কোনো মুহূর্তে জ্যাম্‌সের হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে জলযানটা চলৎশক্তি রোহিত হয়ে পড়বে কিংবা কোন ডুবন্ত পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। জ্যাম্‌সের সঙ্গে মৃত্যু ঘটবে তাদেরও।

বনহুর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো জ্যাম্‌স বাবাকে ইরান সাগরে পৌঁছানো পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে।

জ্যাম্‌স বাবার হাত দু'খানা ক্রমান্বয়ে নেতিয়ে আসছে যেন সত্যি ওর কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছে বনহুর। জলযানটা ঘণ্টায় কমপক্ষে পাঁচশত মাইল স্পীডে ছুটে চলেছে কিন্তু তবুও পুরো তিন-চার ঘণ্টায় ঝাম সাগর অতিক্রম করতে সক্ষম হলো না।

বনহুর বার বার তার হাতঘড়িটা দেখে নিচ্ছিলো।

জ্যাম্‌স ঠিক পথেই চলেছে বুঝতে পারলো বনহুর আর জীম্‌স মীরা। কারণ মাঝে মাঝে বনহুর আর জীম্‌স মীরা ম্যাপখানা দেখে নিচ্ছিলো।

কয়েক ঘণ্টা পর জ্যাম্‌স বনহুর আর জীম্‌স মীরাকে নিয়ে অদ্ভুত জলযানটা ইরান সাগরে পৌঁছল।

ভয়ঙ্কর জ্যাম্‌স বাবা এতোক্ষণ কোনরকম উক্তি উচ্চারণ করেনি, এবার সে বললো—রত্নদ্বীপের ম্যাপখানা আমাকে দিয়ে দাও।

বনহুর তার পিস্তল তখনও জ্যাম্‌সের পাঁজরে চেপে ধরে ছিল, বললো—বলেছি তো রত্নদ্বীপে পৌঁছেই দিয়ে দেবো।

আমি বিশ্বাস করি না তোমাকে : বললো জ্যাম্‌স।

চলো বন্ধু রত্নদ্বীপে গিয়ে তারপর তুমি তোমার ম্যাপ ফিরে পাবে। কথার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের চাপ দেয় সে জ্যাম্‌সের পাঁজরে।

জ্যাম্‌স সজাগ হবার চেষ্টা করে।

কিন্তু আর বেশিক্ষণ জ্যাম্‌স জীবিত থাকবে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ তার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে হয়ে আসছিল। পিস্তলের দ্বারা ভয় দেখিয়ে তাকে জলযান চালনায় বাধ্য করলেও মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

বনহুর বললো—ইরান সাগরে পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে জ্যাম্‌স?

জ্যাম্‌স বললো—পথ আর বেশি নেই, তবে আমি যেন কেমন অসুস্থ বোধ করছি। তোমাকে ইরান সাগরে পৌছে দিতে পারবো কিনা সন্দেহ---জ্যাম্‌স হ্যাণ্ডেলের উপর মাথাটা রাখলো।

বনহুর বিপদ গণলো, সর্বনাশ হবে তাহলে। জ্যাম্‌স বাবার মৃত্যু হলেও জলযানটা বিক্ষিপ্তভাবে যে কোন দিকে ছুটে যাবে কোন ডুবন্ত পাথরে বা পাহাড়ে আঘাত লেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

বনহুর শত চেষ্টা করেও জ্যাম্‌স বাবাকে আর জীবিত রাখতে সক্ষম হলো না। জ্যাম্‌স বাবা কাৎ হয়ে পড়ে গেলো হ্যাণ্ডেলের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর জ্যাম্‌সের দেহটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরলো।

জলযানটা এক মুহূর্তের জন্য ঘুরপাক খেল গভীর জলের মধ্যে। জীম্‌স ভয়ার্তভাবে চিৎকার করে উঠলো—বন্ধু, একি হলো! এখন উপায়?

বনহুর সান্ত্বনা দিয়ে বললো—জীম্‌স ভয় পেও না, চুপ করে বসে থাকো, নিশ্চয়ই আমি জলযানটা চালিয়ে নিতে সক্ষম হবো।

এতোক্ষণ বনহুর ভালভাবে জ্যাম্‌সের চালনা লক্ষ্য করেছিল। যদিও জলযানটা ঠিক সাবমেরিনের মত নয় কিন্তু এর মেশিনপত্র প্রায় একই রকম। বুদ্ধিমান বনহুর জ্যাম্‌স বাবার মতই জলযানটা চালনা করতে লাগলো।

জলযানটা ভীষণভাবে একটা পাক খেয়ে মাতালের মত বেখেয়ালীভাবে ছুটতে লাগলো। বনহুর হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে স্পীড কমিয়ে দিল। অনেক ধীরে চলতে লাগলো এবার জলযানটা।

জ্যাম্‌স বাবার বিরাট বাপুটা চালক আসনে কাৎ হয়ে থাকায় বনহুরের অসুবিধা হচ্ছিলো। বনহুর জলযানটা সম্পূর্ণ থামিয়ে ফেললো।

জীম্‌স বললো—কি করবে তুমি?

হতভাগ্য জ্যাম্‌সকে জলযান থেকে সরিয়ে ফেলবো।

ঠিক, সেই ভাল হবে। বললো জীম্‌স মীরা।

বনহুর জলযানের কপাট খুলে ফেললো, তারপর জ্যাম্‌সের বিশাল দেহটা টেনে ফেলে দিলো সমুদ্রজলের মধ্যে। বললো বনহুর—জ্যাম্‌স বাবা শেষ পর্যন্ত মরলো এবার! যাক, আমরা এখন ইরান সাগরে এসে গেছি।

জ্যাম্‌সের লাশটা সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে মেশিনে চাপ দিতেই সমুদ্রের যে পানি জলযানে প্রবেশ করেছিল বেরিয়ে গেলো , ঢাকনা বা দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো আপনাআপনি।

এবার বনহুর আর জীম্‌স মীরা বসলো পাশাপাশি। জীম্‌স মীরার উরুর উপর মেলানো রয়েছে রত্নদ্বীপের পথ-নির্দেশ ম্যাপখানা।

বনহুর জ্যাম্‌সের অনুকরণে জলযানটা চালনা করে চলেছে। দিকদর্শন যন্ত্রের সাহায্যে পথ চিনে নিচ্ছিলো। এখন যে স্থানে তারা পৌঁছেছে এখানে থেকে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে হলো ইরান সাগর এবং রত্নদ্বীপ।

বনহুর দিকদর্শন যন্ত্রে লক্ষ্য রেখে ভালভাবে জলযানটা চালনা করতে লাগলো। তবে জ্যাম্‌স যেমন স্পীডে চালিয়ে যাচ্ছিলো তেমন স্পীডে বনহুর চালাতে না পারলেও বেশ দ্রুত বেগেই ইরান সাগর অতিক্রম করে চললো।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বনহুর জীম্‌সসহ ইরান সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এসে পৌঁছে গেলো । এবার তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি ডুবন্ত পাহাড়ের অনতিদূরে পৌঁছতে সক্ষম হলো।

কিনতু রত্নদ্বীপ খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়লো।

বনহুর জলযানটা এবার থামিয়ে ম্যাপটা নিজের চোখের সামনে মেলে ধরলো। জীম্‌স মীরাও দেখতে লাগলো তার সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে।

রত্নদ্বীপ খুঁজে পাওয়া সহজ কথা নয়, তদুপরি শুকনো মাটির উপর নয়— গভীর জলের তলায়।

বনহুর আর জীম্‌স মীরা জলযান নিয়ে ডুবন্ত পাহাড়ের চারপাশ দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো।

❑

ঝাম শহর ত্যাগ করে 'শাহী' জাহাজ এবার ফিরে চললো কান্দাই অভিমুখে। জাহাজে সম্মুখভাগে শোকের চিহ্নস্বরূপ কালো পতাকা উড়ছে।

রহমান আর মাহবুব বিষণ্ন মনে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পতাকার নিচে রেলিং-এর ধারে। জাহাজের প্রত্যেকের মুখেই বিষাদের ছায়া। রহমান গভীর কণ্ঠে বললো—শেষ পর্যন্ত সর্দারকে হারিয়ে তবে ফিরে যেতে হলো। কিন্তু ফিরে গিয়ে কি জবাব দেবো সকলের কাছে— রহমানের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো।

জাহাজের প্রত্যেকেই শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

কিউকিলা নিহত হলো, ঝামবাসী আশু বিপদ হতে উদ্ধার পেল। কিন্তু কেউ অন্তর দিয়ে খুশি হতে পারলো না। ঝামসর্দার এবং রাজা মোহন্ত সিন্ধু পর্যন্ত নিরানন্দময় হয়ে রইলেন।

ঝাম শহরবাসীদের মনেও সম্পূর্ণ আনন্দ নেই। যদিও তারা কিউকিলা নিহত হওয়ায় খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল কিন্তু যখন জানতে পেরেছিল কিউকিলার নিহতকারীও সাগর তলে নিরুদ্দেশ হয়েছে তখন তাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিলো। এমনকি অনেকেই অশ্রুবিসর্জন করেছিলো।

'শাহী' জাহাজ নিয়ে রহমান প্রায় দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর ফিরে চলেছে; হঠাৎ যদি নূরী এসে পড়ে তাকে কিছুতেই সান্ত্বনা দেওয়া সম্ভব হবে না।

বিশাল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে রহমান। তার মনে কত রকম প্রশ্ন জাগছে। না জানি আজ সর্দারের দেহটা কোথায় তলিয়ে গেছে—হাঙ্গর-কুমীরের পেটে চলে গেছে হয়তো। কথাটা স্মরণ হতেই শিউরে উঠে রহমান।

এমন সময় একজন চিৎকার করে উঠলো—ছোট সরদার দেখুন দেখুন ঐ যে একটা লাশ ভেসে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

চমকে উঠলো রহমান, তাকালো দূরে—সত্যি একটা কি যেন ঢেউ-এর উপর দোল খেয়ে খেয়ে ভেসে চলেছে। অন্যান্য সকলেই দেখতে লাগলো। সবাই একবাক্যে বললো, ওটা কোন মৃতদেহ ছাড়া কিছু নয়।

রহমান বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখলো এবং বিস্মিত হলো মৃতদেহের পরনে রয়েছে ডুবুরী ড্রেস। বিরাট আকার লাগছে লাশটা তবে কি পঁচে ফুলে অমন হয়ে গেছে।

রহমান নিজেকে সংযত করে নিল—সে বুঝতে পারলো ওটাই তাদের সর্দারের মৃতদেহ। তখনই 'শাহী' থেকে বোর্ট নামানো হলো। অন্যান্য কয়েকজন অনুচরসহ রহমান নেমে পড়লো বোট নিয়ে সমুদ্রবক্ষে।

'শাহী' তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে।

রহমানের বুকটা ভীষণভাবে ধক্ ধক্ করছে—নাজানি সর্দারের মুখখানাকে সে কি অবস্থায় দেখতে পাবে। হাতুড়ি দিয়ে কেউ যেন তার হৃৎপিণ্ডটাকে থেতলে দিচ্ছিলো।

বোট নিয়ে কয়েকজন অনুচরসহ রহমান মৃতদেহটার নিকটে পৌঁছে গেলো । নিকটে পৌঁছে অবাক হলো সবাই—দেহটা প্রায় তেলের পিঁপের মত ফোলা লাগছে।

অন্যান্য অনুচরের সাহায্য নিয়ে রহমান মৃতদেহটাকে বোটে উঠিয়ে নিল। এটাই যে তাদের সর্দারের মৃতদেহ তাতে ভুল নেই, কারণ সেই ডুবুরী ড্রেস পরা রয়েছে। পোশাক মৃতদেহের সঙ্গে এঁটে বসে গেছে একেবারে।

রহমান কি করে তার সরদারকে এই বীভৎস বিকৃতরূপে দেখবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়লো, কিন্তু কোন উপায় নেই—মৃতদেহের পোশাক উন্মোচন করতেই হবে। আদেশ দিলো রহমান মাহবুবকে—মাহবুব খুলে ফেল লাশের দেহের পোশাকটা।

মৃতদেহের পোশাক খুলে ফেলার আদেশ দিয়ে নিজে মুখ ফিরিয়ে রাখলো অন্য দিকে।

কয়েকজন মিলে খুলে ফেললো লাশের মুখের অক্সিজেন পাইপসহ মুখোশটা।

মাহবুব বিস্ময়ভরা গলায় বলে উঠলো—ছোট সর্দার এ যে দেখছি হোয়াইট ম্যান। কোন ইংরেজ হবে।

মাহবুবের কথা শুনে রহমান তাড়াতাড়ি এসে লাশটার মুখে দৃষ্টি ফেলল, দেখলো সত্যি তাদের সর্দারের লাশ নয় এটা। বিরাট মোটাদেহী একটা ইংরেজ সাহেব।

রহমানের বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেলো। বললো সে—কোনো হতভাগ্য ডুবুরী হবে।

মৃতদেহের পোশাক খুলে ফেললো ওরা দেখতে পেত—লাশের বুকে ছিলো একটা বিরাট ক্ষত, যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল দস্যু বনহুরের ছুরিকাঘাতে। লাশটা জ্যাম্‌স বাবার মৃতদেহ।

রহমান বললো—ওর দেহের পোশাক খুলে কাজ নেই ওকে সমুদ্রগর্ভে নামিয়ে দাও।

রহমানের আদেশ অনুযায়ী লাশটা পুনরায় সমুদ্রজলে ফেলে দেওয়া হলো। 'শাহী' ছাড়ার জন্য আদেশ দিলো রহমান।

কেন যেন রহমানের বুকটা হাল্‌কা লাগছে আগের চেয়ে অনেক। লাশটা প্রথম দেখার পর যতক্ষণ লাশটার মুখের আচ্ছাদন উন্মোচন করা না হয়েছিল ততক্ষণ তার হৃৎপিণ্ডটা আছাড় খাচ্ছিলো জলের মাছ ডাঙ্গায় তোলার পর যেমন অবস্থা হয় ঠিক তেমনি। কিন্তু যখনই সে দেখলো তার সর্দারের মৃত দেহ নয় সেটা তখনই যেন একটা অনাবিল শান্তি মুছে নিলো তার বুকের জ্বালাটা।

রহমান যখন ঝাম সাগর অতিক্রম করে কান্দাই-এর পথে অগ্রসর হচ্ছে তখন হাজার হাজার মাইল দূরে ইরান সাগরতলে দস্যু বনহুর জীম্‌স মীরাসহ রত্নদ্বীপের সন্ধান করে ফিরছে।

বনহুর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ম্যাপ দেখেও কোন হদিস পাচ্ছে না রত্নদ্বীপের। ম্যাপের নির্দেশ অনুযায়ী ঝাম সাগর থেকে ইরান সাগরে পৌঁছতে যত বেগ পেতে না হয়েছে তার চেয়ে শত শত গুণ বেগ পেতে হচ্ছে রত্নদ্বীপের সন্ধানে।

জীম্‌স বললো—ফ্রেণ্ড আর পারছি না সহ্য করতে।

বনহুরও বহুক্ষণ অক্সিজেন পাইপ পরে থাকায় বেশ অসুস্থ বোধ করছিলো তবু জীম্‌স মীরাকে বললো—একটু কষ্ট করো জীম্‌স! হয়তো এক্ষুনি রত্নদ্বীপের সন্ধান পেয়ে যাবো।

বনহুর জলযানের স্পীড কমিয়ে দিয়ে ম্যাপখানা পুনরায় মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলো। হঠাৎ আনন্দভরা কণ্ঠে বলে উঠলো—জীম্‌স পেয়েছি। রত্নদ্বীপের সন্ধান পেয়েছি। এই দেখো---ম্যাপখানার এক জায়গায় আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—এই যে ক্ষুদ্র একটি তারকা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছো, এটাই হলো রত্নদ্বীপ।

বনহুর এবার জলযানটার হ্যাণ্ডেল চেপে ধরলো।

ঝাম সাগরের চেয়ে ইরান সাগরের গভীরতা অনেক বেশি। জলযানের মিটারে দেখলো, তারা এখন হাজার হাজার ফুট জলের নিচে রয়েছে। যেখানে হাঙ্গর কুমীর বা কোনোরকম জলজীব নেই। এতো নিচে স্বচ্ছ পানি দেখে বনহুর বিস্মিত হলো—যেন কাকচক্ষুর মত নির্মল পানি।

বনহুর জলযান নিয়ে যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই বেশি আশ্চর্য হচ্ছে সে। গভীর জলদেশে এত সুন্দর স্বচ্ছ পানি। সব যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কোনরকম আগাছা বা জলীয় উদ্ভিদ পর্যন্ত নেই সেখানে।

বনহুর আর জীম্‌স দেখলো—দূরে, অনেক দূরে একটি মন্দিরের চূড়ার মত কিছু নজরে পড়ছে। জীম্‌স চিৎকার করে উঠলো —ফ্রেণ্ড আমরা রত্নদ্বীপের অতি নিকটে পৌঁছে গেছি। ঐ দেখো রত্নদ্বীপের চূড়া দেখা যাচ্ছে।

বনহুর দেখতে পেল অপূর্ব সুন্দর একটা চূড়া ঠিক যেন সোনার মত চক্‌চক্ করছে সেটা গভীর জলের তলায়। শত শত মানিক যেন বসানো আছে চূড়াটার গায়ে।

বনহুর তার জলযান নিয়ে সেই উজ্জ্বল চূড়া লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো।

স্পীড বাড়িয়ে দিলো বনহুর এবার।

জীম্‌সের আনন্দ যেন ধরছে না আর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের জলযানটা পৌঁছে গেলো রত্নদ্বীপের একেবারে সন্নিকটে। বিস্ময়ে বনহুরের চোখে ধাঁধা লেগে গেলো যেন। জীম্‌সের মুখে তাকিয়ে বললো বনহুর সত্যি অপূর্ব!

ফ্রেণ্ড, ভিতরটা তুমি দেখনি—আরও অপূর্ব।

বনহুর আর জীম্‌সের জলযান রত্নদ্বীপের নিকটে পৌঁছলে স্পষ্ট দেখলো—সম্মুখে একটি সুন্দর মণি-মুক্তাখচিত দরজা। কিন্তু দরজা বন্ধ রয়েছে ভিতর থেকে।

জীম্‌স যেন তার অসাড় প্রাণ ফিরে পেয়েছে, বনহুর নেমে পড়তেই সেও বেরিয়ে এলো জলযানের ভিতর থেকে। উভয়ের শরীরেই ডুবুরীদের অদ্ভুত ড্রেস থাকায় তারা বিনা দ্বিধায় জলের মধ্যে নেমে চলাফেরা করতে লাগলো।

বনহুর অবাক হয়ে দেখেছে—কি সুন্দর একটি চূড়া! আসলে ঠিক কোন মন্দিরের চূড়া নয়—একটি ডুবন্ত পাহাড়। পাহাড়ের মাথাটাকে চূড়ার মত মনে হচ্ছিলো। চূড়াটা সম্পূর্ণ সোনার তৈরি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে মণিমুক্তা বসানো রয়েছে। গভীর জলের তলায় রত্নদ্বীপের চূড়াটা ঝলমল করছে!

বনহুর দরজায় চাপ দিলো কিন্তু খুলতে সক্ষম হলো না।

জীম্‌স এসে দরজার পাশে একটা ছোট্ট বোতামে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো ।

কিন্তু আশ্চর্য ভিতরেও ঠিক সোনার তৈরি দেয়াল। দেয়ালে মণি-মুক্তা বসানো। জীম্‌স বনহুরকে নিয়ে প্রবেশ করলো ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো । আরও অবাক হলো বনহুর—রত্নদ্বীপের মধ্যে কোনরকম জল প্রবেশ করেনি।

জীম্‌স বললো—ফ্রেণ্ড, তুমি ঐ পোশাক উন্মোচন করে ফেল।

বনহুরকে লক্ষ্য করে কথাটা বলে জীম্‌স নিজেও শরীর থেকে ডুবুরী ড্রেস খুলে ফেললো।

বনহুরও খুলে ফেললো তার নিজ দেহের পোশাক। বেশ হাল্কা ও স্বচ্ছ লাগাছে এখন।

জীম্‌স আনন্দ উচ্ছল কণ্ঠে বললো—এখন আমি মুক্ত কেউ আমাকে বাবার কাছে যাওয়ায় বাধা দেবে না। এসো ফ্রেণ্ড।

চলো। বললো বনহুর। তারপর জীম্‌সকে অনুসরণ করলো। চারদিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হলো বনহুর—এমন সুন্দর আর মনোরম স্থান সে জীবনে বুঝি আর দেখেনি।

পাথর খোদাই করে স্থানে স্থানে স্বর্ণমূর্তি তৈরি করা হয়েছে। মূর্তিগুলো হিন্দুদের দেবীর মূর্তি বলেই মনে হলো। গভীর সমুদ্রতলে দেবদেবীর মূর্তি-বিস্ময়কর বটে! কোথাও বা শুধু পাথরে খোদাই করা মূর্তি, কোথাও বা স্বর্ণতৈরি মূর্তি। কোন কোন মূর্তির দেহে মণি-মুক্তা খচিত রয়েছে। সর্পাকৃতি এবং মৎস্যকন্যা মূর্তিগুলোর উপরিভাগ সুন্দর নারী মুখ আর নিচের অংশ সর্পলেজ ও মৎসলেজ আকারে তৈরি করা হয়েছে।

আরও অনেক রকম মূর্তি দেখতে পেল বনহুর বড় বড় হস্তীশুঁড় বিশিষ্ট পাথরমূর্তি। কোনটা আবার ঠিক কচ্ছপ আকারের। বনহুর বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখছে আর ভাবছে, হাজার হাজার ফুট পানির নিচে কোন কারিগর এমন সুক্ষ্মভাবে পাথর কেটে এই মূর্তিগুলো তৈরি করেছে। কিন্তু কে দেবে জবাব, জীম্‌স মীরার বয়সই বা কত আর সেই বা কি জানে। বনহুর শুধু নীরবে দেখেই যেতে লাগলো।

জীম্‌স মীরা বললো—ফ্রেণ্ড, তুমি অবাক হয়ে গেছো কিন্তু আমার সঙ্গে এসো, দেখবে আরও কত সুন্দর সুন্দর মূর্তি থরে থরে সাজানো আছে।

বনহুর বললো—জীম্‌স মীরা তোমার বাবা কি মূর্তি পূজারী?

বনহুরের কথা জিভ বের করে দাঁত কামড়ে বললো—ছিঃ ছিঃ ওকথা আর দ্বিতীয় বার বলো না। আমার বাবা মূর্তিপূজারী হবেন কেন? বহুকাল পূর্বে এই রত্নদ্বীপ যার ছিলো তিনি ছিলো মূর্তি-পূজারী। বাবার কাছে শুনেছি, তিনি ছিলো ব্রাহ্মার্ষি। তারই মন্দির ছিলো এটা।

বনহুর অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলো—ব্রহ্মার্ষি! সে আবার কি রকম জাতি?

আমি বেশি জানি না তবে এটুকু জানি তিনি ছিলো ঋষি। বাবাকে তিনি খুশি হয়ে এ মন্দির দান করেছিলো।

বনহুর ঋষি বা এইরকম কোন মহাত্মাদের সম্বন্ধে বেশি অভিজ্ঞ ছিলো না তাই সে জীম্‌সের কথা নিয়ে বেশিক্ষণ না ভেবে পা বাড়ালো— চলো জীম্‌স তোমার বাবার সন্ধান করি।

জীমস আর বনহুর অগ্রসর হলো।

রত্নদ্বীপের মধ্যে যে এত সুন্দর তা আগে ভাবতে পারেনি বনহুর। দ্বীপের মধ্যে ছোট ছোট কুঠরীর মত খোপ রয়েছে। প্রত্যেকটা খোপে থরে থরে সাজানো সোনা দানা আর মনিমুক্তা।

চোখ যেন ঝলসে যায়।

বনহুরের ভাণ্ডারেও বহু সোনা দানা মণিমুক্তা, লক্ষ লক্ষ টাকার লঙ্কার রয়েছে কিন্তু এত বেশি মণিমুক্তা সে দেখেনি সত্য। চারদিক যেন আলোয় ঝলমল করছে।

জীম্‌স মীরা বনহুরসহ রত্নদ্বীপের ভিতর দিয়ে এদিকে সেদিক হয়ে কিছুদূর এগুতেই নজরে পড়লো—ওদিকে একটি পাথরখণ্ডের উপর মাথা রেখে এক বৃদ্ধ শুয়ে আছেন। তার দেহে শ্বাস আছে কিনা সন্দেহ। পরনে ছিন্ন ভিন্ন মলিন পায়জামা আর পাঞ্জাবী ধরণের পোশাক। এককালে এই পোশাকগুলো যে ঝলমল করতো তা এখনও বুঝা যায়।

জীম্‌স বৃদ্ধাকে দেখেই উচ্চঃস্বরে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—বাবা--- ছুটে গিয়ে বসে পড়লো বৃদ্ধের পাশে।'

বনহুর বুঝতে পারলো, এই বৃদ্ধই ইরানের বাদশা শাহ নাশাদ। অবাক হয়ে দেখলো শাহ নাশাদের ভয়ঙ্কর নির্মম অবস্থা।

ধীরে ধীরে শাহ নাশাদ মাথা তুললো, বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। জীম্‌স মীরাকে তিনি যেন চিনতেই পারছেন না। কোঠরাগত চোখ, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, দাড়ি গোঁফ শুভ্র হয়ে গেছে। হাত-পায়ে লৌহশিকল আঁটা। শিকলগুলো হাতে-পায়ে দাগ কেটে বসে গেছে যেন। অসহায় শুষ্ক মুখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছেন শাহ নাশাদ নিজ কন্যাকে।

জীম্‌স মীরা পিতার অবস্থা দেখে সহসা কোন কথা বলতে পারছিল না- কেন যেন কণ্ঠ টিপে ধরেছে তার। জীম্‌স মীরার গণ্ড বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আবার সে ডাকলো—বাবা! আমার বাবা----

এতক্ষণে যেন হুশ হলো ইরান শাহের অতিকষ্টে শুষ্ক গলায় বললো—মা, মীরা।

হাঁ হাঁ, বাবা, আমি তোমার মেয়ে মীরা!

মা, মা----

বলো? বলো বাবা?

ঐ শয়তান নরপিশাচ শয়তান জ্যাম্‌স কই? বৃদ্ধ ইরান শাহের ঘোলাটে চোখ দুটোজ্বলে উঠলো যেন আগুনের গোলার মত।

জীম্‌স মীরা বললো—বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত হও। আর জ্যাম্‌স তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

মীরা।

হাঁ বাবা। এবার তাকালো জীম্‌স মীরা বনহুরের দিকে তারপর বললো—এই যুবক আমাকে শয়তান জ্যাম্‌সের হাত থেকে রক্ষা করেছে বাবা। জ্যাম্‌াসকেও সে হত্যা করেছে।

বৃদ্ধ আনন্দে বাকশক্তি যেন হারিয়ে ফেললেন শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন একটি কথাও যেন তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বের হচ্ছে না। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন ইরান শাহ।

বনহুর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। বৃদ্ধের পাশে, দু'হাতে ধরে বললো—আপনি স্থির হন। বেশি উত্তেজিত হলে হার্টফেল করতে পারেন।

বনহুরের কথায় কান না দিয়ে বলেন ইরান শাহ—কে তুমি যুবক আমার এতোবড় উপকার করলে? বাবা, তোমার পরিচয় পেলে আমি অনেক খুশি হবো।

পরিচয় একদিন জানাবো, এখন হিতৈষী হিসাবেই আমাকে গ্রহণ করতে পারেন।

কি বলে ডাকবো তোমাকে?

আমার নাম মনির। আমাকে এই নামেই ডাকবেন, অবশ্য যতক্ষণ আপনাদের সান্নিধ্যে আছি।

ইরান শাহ তাঁর দুর্বল ক্ষীণ শিকল পরানো বাহু দু'টি দিয়ে বনহুরকে জাপটে ধরলেন—বাবা, তুমি আমার সন্তানের চেয়েও অনেক বেশি---বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো তাঁর গলা।

বনহুর এবার ইরান শাহের চোখের অশ্রু নিজ হাতে মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। কি করে এবার ইরান শাহকে শৃঙ্খলমুক্ত করা যায় সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলো বনহুর।

লৌহশিকলগুলো এমনভাবে ইরান শাহের হাতে পায়ে বসে গিয়েছিলো যে কিছুতেই কেটে বের করা সম্ভব হচ্ছিলো না।

বনহুর কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর ব্যর্থ হয়ে ভাবতে লাগলো কি করা যায়—হঠাৎ মনে পড়লো, নিশ্চয়ই জ্যাম্‌স লৌহশিকলে লাগানো তালার চাবি সঙ্গে নিয়ে যায়নি। হয়তো বা কোথাও রেখে গেছে চাবিগুলো।

জীম্‌স আর বনহুর আশে পাশে খুব ভালভাবে সন্ধান করে দেখতে লাগলো।

হঠাৎ জীম্‌স আনন্দধ্বনি করে উঠলো—ফ্রেণ্ড পেয়েছি। একতাড়া চাবি পেয়েছি।

বনহুর জীম্‌সের আনন্দধ্বনি শুনে খুশি হয়ে এগিয়ে গেলো , দেখলো সত্যিই ওদিকে একটা তাকের উপরে একতাড়া চাবি রয়েছে। চাবিগুলো মরচে ধরে গেছে একেবারে। বনহুর চাবির গোছা নিয়ে ফিরে এলো ইরান শাহের পাশে। দ্রুতহস্তে খুলে ফেললো ইরান শাহের হাত পা থেকে লৌহ শিকলগুলো।

শিকলমুক্ত হয়ে বৃদ্ধ ইরান শাহ হু হু করে কেঁদে উঠলেন, হাত দিয়ে বন্ধন স্থানের ক্ষতগুলো নাড়তে লাগলেন তিনি।

মুক্তির আনন্দে উৎফুল্ল ইরান শাহ পুনরায় তাঁর মুক্ত বাহু দিয়ে স্বচ্ছভাবে বনহুরকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর কন্যা জীম্‌স মীরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রোদন করতে লাগলেন।

❑

ইরান শাহ কিছুটা সুস্থ হবার পর বললেন—জ্যাম্‌সকে হত্যা করেছো জেনে আমি যারপরনাই শান্তি লাভ করেছি মনির। কিন্তু আরও একটি ভয়ঙ্কর শত্রু আছে, যে শুধু নর রক্তপিপাসু নয়, সাংঘাতিক জীব-জলদানব।

জীম্‌স মীরাই জবাব দিল—বাবা, তুমি শুনে আরও খুশি হবে যে, জলদানব কিউকিলাকেও এই যুবক নিহত করেছে।

বলো কি মীরা।

হ্যাঁ বাবা।

ইরান শাহ এবার দু'হাতে বনহুরের হাত দু'খানা চেপে ধরলেন —এও কি সত্যি কথা?

হ্যাঁ, সত্যি! শাহানশাহ, আপনি সম্পূর্ণ রাহুমুক্ত—

বনহুরের কথায় ইরান শাহের মুখ দীপ্ত-উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তিনি আবেগভরা কণ্ঠে বললেন—বাবা মনির আমি তোমাকে আমার সব দেবো; আমার সব দেব তোমাকে। নাও, যত খুশি মণিমুক্তা যা তোমার ইচ্ছা নাও।

বনহুর শান্তকণ্ঠে বললো—শাহানশাহ, আমার এসবে কোনো প্রয়োজন নেই।

তা হয় না বাবা, তোমাকে নিতেই হবে কিছু। এসো আমার সঙ্গে যা তোমার মনে চায় নেবে।

ইরান শাহ বনহুর আর জীম্‌স মীরাসহ রত্নদ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। এ যেন এক অদ্ভুত রাজ্য, চারদিকে শুধু মুণিমুক্তাখচিত নানারকম দেব-দেবীর মূর্তি আর সেসব দেব-দেবী মূর্তির পাদমূলে এক-একটি জ্বালা

বা বাক্স সাজানো রয়েছে। বাক্সগুলোর ঢাকনা উঁচু করে ধরলেন ইরান শাহ। তারপর বললেন—নাও, যত খুশি নাও।

বনহুর বললো—থাক ওসবের প্রয়োজন হবে না আমার।

তা হয় না, তোমাকে কিছু নিতেই হবে বাবা।

ইরান শাহ একটির পর একটি জ্বালার ঢাকনা খুলে ধরতে লাগলেন। উজ্জ্বল নীলাভো আলোয় ঝক্‌মক্ করে উঠছিলো চারদিকে।

ইরান শাহ কতকগুলো মণিমুক্তা তুলে নিয়ে বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন—এগুলো তোমাকে নিতেই হবে মনির।

বনহুর এবার কোন কথা বলতে পারলো না, ইরান শাহের হাত থেকে উজ্জ্বল নীলাভো মণিমুক্তাগুলো নিয়ে পকেটে রাখলো।

ইরান শাহ খুশি হলেন, তিনি বহু লোক দেখেছেন কিন্তু বনহুরের মত লোভহীন কাউকে তিনি দেখেননি। রত্নদ্বীপের মনিমুক্তা তাকে বিচলিত করতে পারলো না।

এক সময় রত্নদ্বীপ দেখা শেষ হলে বললেন ইরান শাহ—বৎস, তুমি জ্যাম্‌স আর কিউকিলাকে হত্যা করে আমার কন্যা এবং আমাকে আশু মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছো। রক্ষা করেছো আমার রত্নদ্বীপ। এবার দয়া করে আমাকে আমার রাজ্যে পৌঁছে দিয়ে কৃতার্থ করো।

বনহুর মৃদু হেসে বললো—শাহানশাহ, আমি সেজন্য প্রস্তুত আছি। যতক্ষণ আপনাকে এবং আপনার কন্যাকে স্বদেশে পৌঁছে দিতে না পেরেছি ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত নই।

❑

বনহুর ইরান শাহ এবং তাঁর কন্যা জীম্‌স মীরাকে নিয়ে ইরান রাজ্যে ফিরে এলো।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন শাহানশাহ, ভুলে গেলো এতদিনের নির্মম কষ্টের কথা, শাহানশাহ ভাবতেও পারেননি আবার তিনি মুক্তিলাভ করবেন, আবার ফিরে আসবেন নিজ রাজ্যে—এ যেন তাঁর কল্পনার বাইরে

ছিলো, কারণ জ্যাম্‌স আর কিউকিলার কবল থেকে কোনদিনই পরিত্রাণের আশা ছিলো না তাঁর।

জীম্‌স মীরার আনন্দও যেন ধরছে না, বিশেষ করে পিতার উদ্ধার এবং জ্যাম্‌স আর কিউকিলার হত্যা তার মনকে স্বচ্ছ করে তুলেছিলো। আর একটি বাসনাও তাকে উচ্ছল আনন্দে মুখর করে তুলেছিলো—অপরিচিত যুবকটিকে নিজের করে পাবে সেই আশায়। বড় ভাল লাগছিলো বনহুরকে জীম্‌স মীরার।

শাহানশাহ এবং জীম্‌স মীরার আনন্দে বনহুরও বেশ তৃপ্তি অনুভব করছিলো।

শাহানশাহ এবং জীম্‌স মীরাসহ যখন ইরান রাজদরবারে হাজির হলো বনহুর তখন সে বিস্ময়াহত হয়ে পড়লো। রাজমন্ত্রী তখন ইরান সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। সে বাদশাহ নাশাদ এবং তাঁর কন্যা জীম্‌স মীরাকে অস্বীকার করলো। উন্মাদ বলে বাদশাকে বন্দী করার জন্য আদেশ দিল।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে গেলো মন্ত্রীবরের কথা শুনে প্রধান সেনাপতি এবং অন্যান্য সবাই বাদশাহকে চিনতে পেরেছিল কিন্তু উপস্থিত বাদশাহের বিপক্ষে কোন কথা বলার সাহস তাঁরা পেলো না।

বাদশাহ নিরুদ্দেশ হবার পর মন্ত্রী রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছিলো, কিন্তু জ্যাম্‌স পুনরায় রাজকন্যা মীরাকে চেয়ে বসলো এবং ভয় দেখালো জলদানব কিউকিলা দ্বারা তার রাজ্য ধ্বংস করেফেলা হবে যদি মীরাকে তার হস্তে অর্পণ না করেন।

মন্ত্রী রাজ্যের মঙ্গলার্তে রাজকন্যা মীরাকে সমর্পণ করেছিলো সেদিন। প্রথম মন্ত্রীবর কুচক্রী ছিলো না সে বাদশাহর অভাবে অন্যান্যের মতামত নিয়েই সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক রাজ্য চালনার ভার গ্রহণ করেছিলো।

কিন্তু রাজসিংহাসনে উপবেশনের পর তার মধ্যে জেগে উঠে এক লালসাপূর্ণ প্রাণ। সিংহাসনের মোহ তাঁকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে।

ক্রমে মন্ত্রীবর ইরান রাজ্যে নিজেকে একমাত্র অধিষ্ঠাতা বলে মেনে নেবার জন্য প্রজাদের বাধ্য করে ছলে-বলে কৌশলে।

অনেকেই শাহ নাশাদের অন্তর্ধানে মুষড়ে পড়েছিল। তারা সর্বান্তঃকরণে বাদশাহর আগমন প্রতীক্ষায় উদগ্রীব ছিলো। তারা মন্ত্রীবরকে কিছুতেই বাদশাহ বলে মেনে নিতে চাইছিলো না।

মন্ত্রীবর এইসব নাগরিকের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলো। অনেক ব্যক্তিই মন্ত্রীর নির্মম আচরণ মাথা পেতে গ্রহণ করতে লাগলো তবু তাঁকে বাদশা বলে স্বীকার করলো না। দেশব্যাপী প্রজাদের মধ্যে শুরু হলো এক বিদ্বেষ ভাব। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে সাহসী হতো না। যদি কেউ কিছু বলতো বা মন্ত্রীবরের বিরুদ্ধাচরণ করতো তাকেই কারারুদ্ধ করা হতো না হয় দেওয়া হত মৃত্যুদণ্ড।

প্রধান সেনাপতি প্রকাশ্যে কিছু না বললেও তিনি মন্ত্রী বরের উপর প্রসন্ন ছিলো না। ভিতরে ভিতরে তিনি মন্ত্রীকে দেখতে পারতেন না। গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করতেন এবং বাদশাহ নাশাদের অনুসন্ধান করতেন।

আজ যখন ইরানশাহসহ রাজকুমারী রাজদরবারে হাজির হলো তখন দরবারস্থ সকলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে ছিলো; কিন্তু যে মুহূর্তে মন্ত্রীবর অস্বীকার করে বসলেন—কে এইবৃদ্ধ, আমি চিনি না—বন্দী করো এদের।

বনহুর তখন লক্ষ্য করেছিলো—সেনাপতির চোখ দু'টো ক্রুদ্ধভাবে জ্বলে উঠেছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই ব্যথা-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলো তাঁর মুখমণ্ডল। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস পাচ্ছিলেন না যেন তিনি। শুধু সেনাপতিই নন, দরবার কক্ষের অনেকেই বাদশাহ এবং তাঁর কন্যাকে চিনতে পেরেছিলো।

মন্ত্রী রাজার কথায় আসল রাজা যখন বন্দী হলেন তখন দরবারে সবাই বিস্ময়াহতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে পড়লো, কারো কণ্ঠ দিয়ে কোন কথা বের হলো না।

মন্ত্রীরাজার আদেশ পালন হবার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়লো।

বাদশাহ আর জীম্‌স মীরা বন্দী হলো।

বন্দী হবার পর শাহানশাহ এবং মীরা ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাদের বন্ধুর সন্ধান করতে লাগলো কিন্তু রাজদরবারের আশে পাশে তাকে নজরে পড়লো

না। সন্দিহান হয়ে উঠলো ইরান শাহের মন, জীম্‌স মীরার মনেও দাগ কাটলো। এতোক্ষণ যে সর্বসময় সঙ্গে সঙ্গে ছিলো হঠাৎ সে কোথায় উধাও হলো। তবে কি তারই কোন চক্রান্ত রয়েছে তাদের এই বন্দী হবার পিছনে?

ইরান শাহ আর ইরান রাজকুমারীকে বন্দী করে কারাগারে নিয়ে আটকে রাখা হলো। শয়তান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কেউ সাহসী হলো না।

দেশবাসী জানালো—একজন উন্মাদ ইরান রাজ্যের সিংহাসনের অধিকার নিয়ে নিজকে ইরান শাহ বলে পরিচিত করার প্রচেষ্টা নেওয়ায় তাকে বাদশাহ বন্দী করেছেন।

জনগণের মুখে মুখে কথাটা নানাভাবে ছড়িয়ে পড়লেও সেদিন রাজদরবারে যেসব রাজকর্মচারী উপস্থিত ছিলো তাঁরা সবাই জানলেন কতবড় একটা অন্যায় সংঘটিত হলো।

ইরান শাহ আর জীম্‌স মীরা অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী হয়ে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলো। তারা কত আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে এসেছিলো নিজ রাজ্যে, সব বাসনা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে! ইরান শাহ কন্যাকে বললেন—দেখলি মা, কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। নিজ রাজ্যে ফিরে এসে লাঞ্ছিত হবার চেয়ে ইরান সাগরতলে মৃত্যুই শ্রেয় ছিলো। মনির চক্রান্ত করে আমাদের বন্দী করলো।

জীম্‌স বললো—বাবা এতে ওর কি স্বার্থ থাকতে পারে?

স্বার্থ না থাকলে সে অমনভাবে আমাদের বিপদে ফেলে সরে পড়তো না।

কিন্তু ওকে আমি কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারছি না। ফ্রেণ্ড যদি জ্যাম্‌স আর কিউকিলাকে হত্যা না করতো তাহলে আমাদের কি সংঘাতিক অবস্থা হতো? বাবা, বিশেষ করে তোমার জন্য বড় দুর্ভাবনা ছিলো।

ব্যথা করুণ হাসি হাসলো ইরান শাহ—তার চেয়েও বেশি দুর্ভোগ এখন আছে আমাদের ভাগ্যে। মীরার মন্ত্রী ইলিয়াস আমাদের হত্যা না করে শান্তি পাবে না।

মীরা আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে বললো—বাবা এখন উপায়?

উপায় কিছুই নেই মা। মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকতে হবে।

একটু চিন্তা করে বললো জীম্‌স মীরা—মনিরকে আমি এখনও অবিশ্বাস করতে পারছি না বাবা, কারণ রত্নদ্বীপের রত্ন যাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি---

জানিস না মা সব ছলনা। যুবক অত্যন্ত চালাক আর বুদ্ধিমান। জ্যাম্‌স আর কিউকিলা হত্যা করে সে প্রথমে নিজের পথ খোলাসা করে নিয়েছে। তারপর সে তোকে মুগ্ধ করেছে নানাভাবে। রত্নদ্বীপের ম্যাপের সন্ধান পেয়েছে তোর কাছে। ম্যাপখানা হস্তগত করার পরও সে তোকে বাধ্য করেছে রত্নদ্বীপে আসতে এবং আমার সঙ্গে তোর মিলনের মধ্যেমে নিজকে বিশ্বাসী করে তোলার প্রয়াস পেয়েছে---

জীম্‌স মীরা অবাক হয়ে শুনে চলেছে পিতার কথাগুলো।

যদিও অন্ধকার কারাকক্ষে পিতার মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো না তবু সে উপলব্ধি করছে তাঁর হৃদয়ের ব্যথা। লোকটাকে সে দৃঢ় বিশ্বাস করেছিলো কিন্তু পিতার কথায় জীম্‌সের মনেও অবিশ্বাসের ছায়াপাত ঘটলো।

শাহানশাহ বলে চললেন—ইলিয়াসের পরামর্শেই মনির সাধু সেজে এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলো, কাজ সমাধা করে নিজ চরিতার্থ পূর্ণ করেছে।

জীম্‌স মীরা নীরব রইলো, কোনো কথা সে বলতে পারলো না।

এদিকে বাদশাহকে বন্দী করেও নিশ্চিন্ত হলো না মন্ত্রী ইলিয়াস। তিনি গোপনে বাদশাহ ও তাঁর কন্যাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। কোনোক্রমে বাদশাহ এবং রাজকন্যাকে জীবিত রাখা উচিত নয় বুঝতে পারলো শয়তান মন্ত্রীবর।

❑

গভীর রাতে সমস্ত ইরান নগরী যখন নিদ্রায় অচেতন,তখন কারাগার কক্ষে প্রবেশ করলো মন্ত্রীবর শয়তান ইলিয়াস।

ইলিয়াসের সঙ্গে রয়েছে আরও দুজন অনুচর। এক জনের হস্তে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা আর একজনের হস্তে রয়েছে জ্বলন্ত মশাল।

মন্ত্রী রাজ-কারাগারের সম্মুখে পৌঁছতেই রক্ষী লৌহকপাট উন্মোচন করে সরে দাঁড়ালো।

নিস্তব্ধ রাত্রির জমাট অন্ধকারে একটা কড়কড় শব্দের প্রতিধ্বনি জাগলো। ভূতলে শায়িত ইরান শাহের নিদ্রা ছুটে গেলো মুহূর্তের জীম্‌স মীরাও আচমকা উঠে বসলো। তাকালো তারা সম্মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলো বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো উভয়ের মুখমণ্ডল।

সাক্ষাৎ যমদূতের মত ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে কারাগারে প্রবেশ করছে মন্ত্রী ইলিয়াস ও তার অনুচরদ্বয়। দ্বিতীয় অনুচরের হস্তের মশালের আলোতে প্রথম অনুচরের হস্তে ছোরাখানা ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো।

শিউরে উঠলো জীম্‌স মীরা। ভয়ে সে পিতাকে জড়িয়ে ধরলো—বাবা।

জীর্ণ দেহ, মলিন ছিন্নভিন্ন পোশাক পরিহিত ইরান শাহ কন্যাকে বুকে চেপে ধরলেন—মা! ভয় নেই মা খোদা আমাদের সহায় আছেন।

ইলিয়াস বজ্রপদক্ষেপে ইরান শাহ আর রাজকুমারী মীরার সামনে এসে দাঁড়ালো—কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না শাহানশাহ। যে দু'দিন বাঁচতে তাও আর পারলে না। বলো কে তোমাদের উদ্ধার করে এখানে এনেছে?

ইরানশাহ ও জীম্‌স মীরা তখন উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, পিতা-পুত্রী অসহায় করুণ চোখে তাকাচ্ছে নির্দয় পিশাচ ইলিয়াসের অগ্নিচক্ষুর দিকে। জীম্‌স মীরা বার বার দেখে নিচ্ছিলো ভীষণ চেহারার প্রথম অনুচরটির হস্তস্থিত সুতীক্ষ্ণ ছোরাখানা, না জানি এই মুহূর্তে ঐ ছোরাখানা কার বুকে প্রবেশ করবে—হয় পিতা নিহত হবে তার চোখের সম্মুখে নয় তারই মৃত্যু হবে।

জীম্‌স মীরার চিন্তাধারায় বাধা পড়ে, কর্কশ কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলো ইলিয়াস—শাহানশাহ, আফসোস একটু পরেই তোমাকে এবং তোমার কন্যাকে পরপারে পাঠাতে হচ্ছে, কারণ ইরানের রাজসিংহাসন এখন আমার।

ইরানশাহ এতোক্ষণে কথা বললেন—বেশ, তাই নাও। ইরান সিংহাসন তুমিই নাও। কিন্তু আমাকে আর মীরাকে তুমি হত্যা করো না ইলিয়াস।

গর্জে উঠলো ইলিয়াস—রাজসিংহাসনের মায়া ত্যাগ করতে পারবে শাহানশাহ?

পারবো। পারবো ইলিয়াস।

তাহলে কেন তুমি এখানে এলে? কে তোমাদের দু'জনকে এখানে নিয়ে এসেছে বলো?

ইরানশাহ জবাব দিলো—এক অপরিচিত যুবক। আর সে যুবকই কৌশলে আমাদের দু'জনাকে ইরান সাগর থেকে উদ্ধার করে তোমাদের দরবারে হাজির করেছিলো এবং তার চক্রান্তেই আমরা বন্দী হয়েছি।

ইলিয়াস তাকালো তার সঙ্গীদ্বয়ের মুখে বললো—তোমরা জানো কে সে?

প্রথম অনুচর বললো—না শাহানশাহ, আমরা জানি না কে সে আর কি তার পরিচয়।

ইরানশাহ বললেন—ইলিয়াস সে যুবক যে তোমারই একজন অনুচর তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার অনুচর! না সে আমার অনুচর নয়। যাক সে যেই হউক কোনো স্বার্থ নিয়েই সে তোমাকে আর রাজকন্যাকে নিয়ে রাজদরবারে হাজির হয়েছিলো—উদ্দেশ্য ছিলো রাজ সিংহাসন এবং তোমার কন্যা মীরাকে---

না, তার কোন লোভ ছিলো না। বললো মীরা।

যাক সে কথা শুনার বা জানার সময় আমার নেই। ইলিয়াস তাকালো প্রথম অনুচরের দিকে তারপর ইংগিত করলো শাহানশাহের বুকে ছোরা বসিয়ে দেয়ার জন্যে।

প্রথম অনুচর ইলিয়াসের ইংগিত পাওয়া-মাত্র ছোরাখানা উদ্যত করে শাহানশাহ নাশাদের বুকে বসিয়ে দিতে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে জীম্‌স মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে পিতার বুকে—না না, আমার বাবাকে হত্যা করো না। আমার বাবাকে হত্যা করো না ইলিয়াস---

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ইলিয়াস—হাঃ হাঃ হাঃ তোমার বাবাকে হত্যা করা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। তারপর তুমি হবে আমার বেগম----কথাটা বলে মীরাকে বৃদ্ধ শাহানশাহের কাছ থেকে এক ঝটকায় টেনে নেয়।

প্রথম অনুচর এবার ছোরাখানা শাহানশাহের বুকে আমূলে বসিয়ে দিতে যায়।

কিন্তু ছোরাখানা শাহানশাহের বুকে বিদ্ধ হবার পূর্বেই প্রথম অনুচরটি তীব্র আর্তনাদ করে পড়ে যায় ভূতলে।

কারাগারস্থ প্রত্যেকেই চমকে উঠলো।

ইলিয়াস তাকালো ভুলুণ্ঠিত অনুচরটির দিকে রক্তে ভেসে যাচ্ছে কারাগারের মেঝে, অনুচরটির পিঠে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে একখানা তীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

ইরান শাহ এবং জীম্‌স মীরাও হতবাক বিস্মিত হয়ে পড়লো —কে তাদের যমদূতকে যমালয়ে পাঠালো। সবাই তাকালো কারাগার কক্ষের দরজার দিকে।

মুহূর্তে আশ্চর্য স্তব্ধ হয়ে পড়লো সবাই, দেখতে পেলো, কারাগার কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত জমকালো পোশাক পরা লোক। মাথায় পাগড়ী দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। কাজেই তাকে চিনবার কোনো উপায় নেই।

সকলের চোখেমুখে যখন ভীত আর বিস্ময় ভাব, তখন জমকালো মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে তাদের সম্মুখে। সবাই দেখলো দক্ষিণহস্তে আরও একটি সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

ইলিয়াস অল্পক্ষণ নিজকে সংযত করে নিলো, তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো—কে তুমি?

আমি কে সে পরিচয় নাই বা শুনলে কিন্তু মনে রেখো ইরান সিংহাসন তোমার জন্য নয়।

আমার জন্য নয়। অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো ইলিয়াস।

গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে বললো কালোমূর্তি —না, কারণ ইরান সিংহাসনের আসল অধিকারী ফিরে এসেছে।

কে তুমি? ইলিয়াস চিৎকার করে উঠলো।

এবার জমকালো মূর্তি বলে উঠলো—আমার পরিচয় জানার যখন এতো সখ তাহলে শোন দস্যু বনহুর আমার নাম।

দস্যু বনহুর। ভয়ার্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো ইলিয়াস।

ইরান শাহ আর জীম্‌স মীরাও সেই সঙ্গে ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলো—দস্যু বনহুর।

দ্বিতীয় অনুচরটি যে এতোক্ষণ মশাল হস্তে দণ্ডায়মান ছিলো দস্যু বনহুর নাম শ্রবণে তার হাত থেকে খসে পড়লো জলন্ত মশালখানা।

বনহুর দৃঢ়কণ্ঠে বললো—ইলিয়াস মশাল উঠাও।

কম্পিত হস্তে ইলিয়াস মশালখানা ভূতল হতে তুলে নিলো।

বনহুর বললো—দাও, তোমার অনুচরটির হাতে দাও মশালখানা।

অনুচরের হাতে মশালখানা দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ইলিয়াস।

দ্বিতীয় অনুচরটি মশাল হস্তে থরথর করে কাঁপছে।

বনহুর এবার ইলিয়াসের পাঁজরে তার ধারালো ছোরাখানা চেপে ধরে বললো—তোমার অনুচরের দেহ থেকে ছোরাখানা খুলে নাও তারপর বাদশাহ শাহান্‌শাহ ও তার কন্যার আর রাজকুমারীর বন্ধন উন্মোচন করে দাও।

ইলিয়াস বাধ্য ছাত্রের মত দস্যু বনহুরের আদেশ পালন করলো।

বৃদ্ধা ইরানশাহ এবং রাজকুমারী মীরার চোখেমুখে বিস্ময় আর আনন্দ। খুশিভরা দু'নয়নে অতৃপ্ত চাহনি, না জানি ঐ কালো পোশাকের তলে কেমন একখানা মুখ লুকিয়ে আছে।

ইলিয়াস ইরানশাহ আর জীম্‌স মীরার বন্ধন উন্মোচন করে দিয়েই হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো দস্যু বনহুরকে।

বনহুর মুহূর্তে সরে দাঁড়ালো।

ইলিয়াস হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে কিন্তু পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ালো, পুনরায় ছোরাখানা বসিয়ে দিতে গেলো বনহুরের বুকে।

বনহুর বাম হস্তে ইলিয়াসের ছোরাসহ হাতখানা ধরে ফেললো খপ্ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার দক্ষিণ হস্তস্থিত ছোরাখানা বসিয়ে দিলো ইলিয়াসের তলপেটে।

তীব্র একটা আর্তনাদ করে ইলিয়াস পড়ে গেলো ভূতলে। খানিকক্ষণ ছট্‌ফট্ করে নীরব হয়ে গেলো তার দেহটা।

ইরানশাহ আর জীম্‌স মীরা হতবাক নিস্পন্দ হয়ে পড়লো, একি বিস্ময়কর ব্যাপার! কে এই অদ্ভুত লোকটি। কেমন করেই বা এই লৌহ

কারাঘরে প্রবেশ করলো। আর ইলিয়াসের মত শক্তিশালী শয়তানকে তুচ্ছ কুকুরের মত হত্যা করলো।

জমকালো মূর্তি নিয়ে যখন ইরানশাহ আর জীমূস মীরা ভাবছে তখন কারাগার কক্ষ হতে বেরিয়ে গেছে জমকালো মূর্তিটা। কোথায় গেলো, কেমন করে গেলো ভেবে পেলো না তারা।

মশালধারী অনুচরটি তখনও মশাল হস্তে থর থর করে কাঁপছে। বনহুর কারাঘর হতে বেরিয়ে সোজা এসে দাঁড়ালো প্রধান সেনাপতির প্রাসাদের পিছনে। তারপর উঠে গেলো উপরে।

সেনাপতি তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলো।

বনহুর প্রবেশ করলো তার কক্ষে। খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো তীক্ষ্ণ ছুরির আগা দিয়ে চাদরখানা সরিয়ে ফেললো সেনাপতির দেহ থেকে।

আচম্‌কা জেগে উঠলো সেনাপতি, ধড়মড় করে উঠে বসে সম্মুকে তাকিয়ে আরষ্ট হয়ে গেলো —কে তুমি—কি চাও?

বনহুর বললো—আমার পরিচয়ে প্রয়োজন নেই শুন সেনাপতি তোমাদের ইরানশাহ মুক্ত তাঁকে এনে রাজসিংহাসনে বসাও।

সেনাপতি মুহূর্তে ভয় ও ভীতি বিস্মৃত হয়ে গেলেন, শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালেন তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—সত্যি শাহানশাহ মুক্ত?

হ্যাঁ, তিনি মুক্ত আর শয়তান ইলিয়াস নিহত।

ইলিয়াস নিহত।

হ্যাঁ, আমিই তাকে হত্যা করেছি। শীঘ্র যাও শাহানশাহকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে নগরময় ঘোষণা করে দাও, আমাদের ইরান শাহ নাশাদ ফিরে এসেছেন। কথাটা শেষ করে বনহুর দ্রুত বেরিয়ে যায় যে পথে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করেছিল সেই পথে।

হতবাক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সেনাপতি কে এই অদ্ভুত ব্যক্তি, কিইবা এর পরিচয় আর ইরান শাহের জন্যই তার এত দরদ কেন! কিন্তু কে দেবে এর জবাব—জমকালো মূর্তি তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেনাপতি সেই মুহূর্তে কারাগরে এসে হাজির হলেন এবং ইরান শাহকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

শয়তান মন্ত্রী নিহত হওয়ায় সেনাপতি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

পরদিন রাজ্যময় এক মহা আনন্দহিল্লোল বয়ে চললো। রাজা প্রসাদ সজ্জিত করা হলো। পথঘাট সব আলোকমালায় ঝলমল করে উঠলো। দীন-দুঃখীদের মধ্যে অর্থ বিরতণ করা হতে লাগলো।

রাজ্যের প্রতিটি লোকের মনে খুশির উচ্ছ্বাস তাদের শাহানশাহ ফিরে এসেছেন। সবাই রাজপ্রাসাদের চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালো, সকলেরই ইচ্ছা শাহানশাহকে একনজর দেখবে।

সেনাপতি ইরান শাহনাশাহকে সিংহাসনে উঁপবেশন করিয়ে রাজকন্যা মীরাকেও বসালেন তাঁর পাশে। দরবারকক্ষ সরগরম হয়ে উঠলো। অগণিত প্রজা এসেছে শাহানশাহের দর্শন আশায়।

হঠাৎ নজরে পড়লো জীম্‌স মীরার অগণিত প্রজাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সেই যুবক যে তার পিতা এবং তাকে জ্যাম্‌স বাবা আর কিউকিলার কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছিলো। জীম্‌স মীরার চোখদুটো দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পিতাকে লক্ষ্য করে বললো—বাবা, ঐ দেখো সেই যুবক দাঁড়িয়ে আছে।

শাহানশাহের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো বনহুরের উপর। চমকে উঠলেন—শাহানশাহ। তিনি ভুল বুঝলে—মনে করলেন এই যুবক ইলিয়াসের গুপ্তচর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেনাপতিকে আদেশ দিলো—বন্দী করো এই যুবককে,নিশ্চয়ই ও মন্ত্রীবর ইলিয়াসের লোক।

সেনাপতি বাদশাহের হুকুম পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বনহুরকে গ্রেফতার করার জন্য অনুচরদের নির্দেশ দিলো এবং সে নিজেও তরবারি খুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে পাশের একজন সৈনিকের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সেনাপতির অস্ত্রাঘাত প্রতিরোধ করলো। সে একা দশ-বিশ জন সৈনিকের সঙ্গে লড়াই করে চললো।

হঠাৎ এই অদ্ভুত কাণ্ডে বিস্মিত হয়ে পড়েছিলো দরবারকক্ষের সবাই। যে যেদিকে পারলো সরে পড়ে আত্মরক্ষা করলো। কিন্তু আশ্চর্য একজন যুবকের সঙ্গে এতগুলো সৈনিক পেরে উঠলো না। এমন কি সেনাপতিকে ভূতলশায়ী করে তার বুকে তরবারিখানা চেপে ধরলো।

সেনাপতির এই অবস্থা যখন তখন অন্যান্য সৈনিক অগ্রসর হতে সাহসী হলো না, কারণ বনহুরের অস্ত্রের অগ্রভাগ তখন সেনাপতির পাঁজরে ঠেকে রয়েছে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কেউ এক পা এগুলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতির জীবনলীলা সাঙ্গ করে দেবো। খবরদার কেউ অগ্রসর হবে না।

বনহুরের চেহারা এবং তার কণ্ঠস্বরে দরবারকক্ষের সবাই আরষ্ট হয়ে পড়েছে, কেউ এগুতে সাহসী হলেন না।

দরবারকক্ষের মেঝেতে চীৎ হয়ে পড়ে আছে ইরান সেনাপতি খায়বার আলম, দস্যু বনহুরের তীক্ষ্ণ ধার তরবারির অগ্রভাগ তার পাঁজরে ঠেকে রয়েছে যে কোন মুহূর্তে তরবারিখানা তার পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে।

ইরান শাহ প্রমাদ গণলেন তিনি না পারছেন সৈনিকদের হুকুম করতে, না পারছেন নিজে অস্ত্র ধরতে। হয়তো এখনি তার প্রিয় সেনাপতির প্রাণ বিনষ্ট হতে পারে।

বনহুর এবার বললো—দরবারকক্ষে যার যার হস্তে যে যে অস্ত্র আছে সবগুলো সেনাপতির শিয়রে নিক্ষেপ করো নইলে সেনাপতির মৃত্যু অনিবার্য।

ইরান শাহ নিরুপায় হয়ে নির্দেশ দিলো, তোমরা সমস্ত অস্ত্র সেনাপতির শিয়রে নিক্ষেপ করো।

সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করলো সৈনিকগণ।

সেনাপতির শিয়র অস্ত্রে স্তূপাকার হয়ে উঠলো।

বনহুর আর কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে গেলো দরবারকক্ষ হতে বাইরে।

সেনাপতি ভূতল শয্যা ত্যাগ করেই অস্ত্র উঠিয়ে নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন—সবাই অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নাও। গ্রেফতার করো ঐ অজানা যুবকটিকে।

ইরান শাহ কিছু বলার পূর্বেই সেনাপতি অন্যান্য সৈনিক সহ দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলেন না তারা সেই অজ্ঞাত যুবকটিকে। রাজ্যময় ঘোষণা করে দেওয়া হলো—যেখানেই হউক কোন অজানা-অচেনা লোক নজরে পড়লে তাকেই যেন রাজদরবারে হাজির করা হয়। যে আসল ব্যক্তিকে আনতে পারবে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে।

শহরময় ছড়িয়ে পড়লো ইরানশাহের লোক। সকলেই সন্ধান করতে ফিরতে লাগলো সেই অজ্ঞাত যুবকটির।

দরবারকক্ষে অনেক অজানা লোককেই ধরে আনা হলো কিন্তু ইরান শাহ সবাইকে পরীক্ষা করে ছেড়ে দিলো আসল জনকে পেলেন না।

সপ্তাহ কেটে গেলো প্রায় কিন্তু কেউ আজও সেই অচেনা যুবকটিকে পাকড়াও করে আনতে সক্ষম হলো না।

একদিন ইরান শাহ আর মীরা তাদের বিশ্রামাগারে বসে আলাপ-আলোচনা করছে। আবার রাজ্যে ফিরে এসেছে অনাবিল শান্তিধারা। শয়তান মন্ত্রীবর ইলিয়াসের অন্যায় অত্যাচারে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো তারা এখন নিশ্চিন্ত।

রাজ্যের ব্যাপার নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিলো এমন সময় হঠাৎ তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় সেই জমকালো মূর্তি। সমস্ত দেহ তার জমকালো পোশাক, মাথায় কালো পাগড়ী। মুখে একখানা কালো রুমাল বাঁধা। হাতে একখানা সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

ইরান শাহ এবং জীম্‌স মীরা জমকালো মূর্তিটাকে দেখে বিস্মিত হলো আর হলো আনন্দিত। একদিন এরই সাহায্যে ইরান শাহ ফিরে পেয়েছেন তাঁর হারানো রাজ্য। ফিরে পেয়েছে তাঁর জীবন, মান-সম্মান আত্মীয়-স্বজন। শুধু তাই নয়, পথের কাঁটা শয়তান ইলিয়াসকে হত্যা করেছে এই জমকালো মূর্তি।

ইরান শাহ আর জীম্‌স মীরা জমকালো মূর্তির আগমনে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালো। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পিতা—পুত্রীর মুখমণ্ডল।

বললেন ইরান শাহ—আপনি।

আপনি নয়—বলুন তুমি।

অবাক হলেন ইরান শাহ আর জীম্‌স মীরা। জমকালো মূর্তি বলে কি। ঢোকগিলে বললেন ইরান শাহ—তুমি এসেছো। কি বলে যে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। জানি না তুমি কে, কি তোমার পরিচয়। খোদার ফেরেস্তা কিনা তুমি, তাও জানি না----

সেদিন তো বলেছি আমি দস্যু বনহুর।

কিন্তু তুমি মানুষ নও, ফেরেস্তাই হবে---

না, আমি মানুষ এবং সাধারণ মানুষ। ইরান শাহ আমি শুনলাম, আপনি এক যুবকের সন্ধানে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন?

হ্যাঁ, সে আমার শত্রু। শয়তান ইলিয়াসের গুপ্তচর। তাকে কেউ যদি গ্রেফতার করে এনে দিতে পারে তাহলে আমি তাকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেবো।

আমি যদি তাকে হাজির করে এনে দেই?

আমি তোমাকেই লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবো।

বেশ.....বনহুর দিক্ষণ হস্তে নিজের মুখের রুমাল খুলে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে অদ্ভুত শব্দ করে উঠলেন ইরান শাহ আর জীমস্ মীরা—তুমি.....তুমি.....

হ্যাঁ, আমিই তোমাদের সেই অচেনা-অজানা বন্ধু।

ভয়বিহ্বল, আতঙ্কভরা কণ্ঠে বললেন ইরান শাহ ভাবলেন, নিশ্চয়ই বনহুর তাঁর উপর ক্রোধান্ধ হয়ে পড়েছে—তাই হতবুদ্ধি হয়ে বনহুরের পা চেপে ধরতে গেলেন।

বনহুর ধরে ফেললো তাঁকে—ক্ষান্ত হন শাহানশাহ। আমি আপনার এ ভুলের জন্য মোটেই অসন্তুষ্ট নই।

ইরান শাহ আবেগভরা কণ্ঠে বললেন—শুধু লক্ষ টাকাই তোমাকে দেবো না, আমার রত্নদ্বীপ এবং আমার কন্যা মীরাকেও আমি সমর্পণ করলাম তোমার হাতে। তুমি আমার রক্ষক নও, আমার জীবনদাতা.....

একটু হেসে বললো বনহুর—অনেক অনেক শুকরিয়া শাহানশাহ, এ দু'টির একটিরও প্রয়োজন আমার নেই।

জীমস্ মীরা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—ফ্রেণ্ড।

ইরান শাহ করুণ ব্যথা ভরা কণ্ঠে বললো—মীরা তোমাকে ভালোবাসে।

আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ শাহানশাহ, কিন্তু.....

জীমস্ এবার বনহুরের দিকে অসহায় চোখে তাকালো, সে চাহনী নিষ্পাপ, পবিত্র।

বনহুর জীম্‌সের মুখে তাকিয়ে দৃষ্টি নত করে নিলো, তার মুখ খানাও ব্যথাকরুণ হয়ে উঠেছে। বললো বনহুর—শাহানশাহ বিদায়। জীমস্ মীরা বিদায়.....

জীম্‌স বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—না না, আমি তোমাকে বিদায় দেবো না বন্ধু। আমি তোমাকে.....

কিন্তু ততক্ষণে দস্যু বনহুর বাইরে বেরিয়ে গেছে।

জীম্‌স মীরা ছুটে এলো বাইরে, রাজপ্রাসাদের দ্বিতলের রেলিং-এর পাশে ঝুঁকে পড়ে তাকালো নিচে, ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো—ফ্রেণ্ড.....ফ্রেণ্ড.....ফ্রেণ্ড.....

জমাট অন্ধকারে রাজকুমারী জীম্‌সের কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে ছুটে চললো।

ইরান শাহ এসে দাঁড়ালেন কন্যার পাশে, কাঁধে হাত রেখে ডাকলো—মীরা! সে চলে গেছে মীরা।

❑

ঝাম শহরে ফিরে এলো দস্যু বনহুর।

মহারাজ মোহন্ত সিন্ধু বনহুরকে দেখে আনন্দে আর বিস্ময়ে ফেটে পড়ার উপক্রম হলেন। তিনি রাজ্যজয়ের আনন্দ উপভোগ করলেন হৃদয়ে। মহারাজ মোহন্ত সিন্ধুর সঙ্গে ঝাম শহরের প্রতিটি জনগণ আনন্দে আত্মহারা হলো। ঝাম সর্দার ছুটে এলো দলবল নিয়ে।

ঝাম পর্বতের গুহায় বনহুরের যে আস্তানা আছে সেখানেও সংবাদ পৌঁছলো। সর্দার জীবিত আছে জানতে পেরে খুশিতে উন্মত্ত হয়ে উঠলো তারা।

সবচেয়ে আজ বেশি খুশি মালা।

মালা বনহুরকে পুষ্পহার পরিয়ে অভিনন্দন জানালো।

বনহুর যখন জানতে পারলো, রহমান তার মৃত্যু হয়েছে সন্দেহে শোকাভিভূত হয়ে ফিরে গেছে কান্দাই অভিমুখে তখন সে নিজেও বেশ চিন্তিত হলো। আর একদিকে খুশি হলো সে কিউকিলা নিহত হয়েছে জেনে।

বনহুর স্বয়ং সমুদ্রতীরে এসে পর্বত আকার কিউকিলার মৃতদেহটা দেখলো। তার ডিনামাইট তাহলে ব্যর্থ হয়নি। যদিও বনহুর বুঝতে পেরেছিলো, তার বসানো ডিনামাইট দ্বারা নিশ্চয়ই দৈত্যরাজ কিউকিলা

নিহত হয়েছে। তবু মনটা সচ্ছ হয়েছিলো না যতক্ষণ কিউকিলা নিহত সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হতে না পেরেছিলো।

কিউকিলার মৃতদেহ দেখে বনহুর আশ্বস্ত হলো, তৃপ্ত হলো তার মন। বনহুর মহারাজ মোহন্ত সিন্ধুকে বললো—দৈত্যরাজের দেহটা কোনোক্রমে মাটিতে পুঁতে ফেলা উচিত।

বনহুরের নির্দেশ অনুযায়ী তাই করা হলো।

কিউকিলার বিশাল দেহটা মাটির মধ্যে আশ্রয় পেল।

বনহুরকে পেয়ে ঝাম শহরে আনন্দ উৎসব শুরু হলো। খুশির অন্ত নেই কারো। শত শত লোক বনহুরকে দেখার জন্য আসতে লাগলো রাজদরবারে। কারণ ঝাম শহরবাসী প্রত্যেকে আজ তার কাছে কৃতজ্ঞ। সাংঘাতিক মৃত্যুর মুখ থেকে আজ তারা মুক্তি পেয়েছে।

বনহুর সকলের অভিনন্দন হাসিমুখে গ্রহণ করে চললো।

কিন্তু বিপদে পড়লো বনহুর মোহন্ত সিন্দুর কন্যা মালাকে নিয়ে। মহারাজের ইচ্ছা, দেবরাজের সঙ্গে কন্যা মালার বিয়ে দেন এবং সেভাবেই পূর্বে কথা ছিলো।

বনহুর মোহন্ত সিন্ধুকে জানালো, সে হিন্দু নয়—মুসলমান; কাজেই তাদের বাসনা সিদ্ধ হবার নয়।

মোহন্ত সিন্ধু এতোদিন জানতেন না তাই তিনি দেবরাজের হস্তে কন্যা অর্পণ করার মনস্থ করেছিলো। সব বাসনা তাঁর চূর্ণ হলো।

কিন্তু মালাকে এড়ানো বিপদ হয়ে দাঁড়ালো বনহুরের।

মালা বললো—দেবরাজ, তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে? এত নিষ্ঠুর-পাষাণ তুমি?

বনহুর মালার চিবুকটা তুলে ধরলো—তুমি হিন্দু আর আমি মুসলমান। মালা, জাতি ভিন্ন হলে কোনদিন বিয়ে হতে পারে না। এতে উভয়েরই অমঙ্গল হয়। কাজেই তোমার আমার মিলন হতে পারে না।

সরল-সহজ প্রাণে মালা সর্বান্তঃকরণে বনহুরের কথাগুলো বিশ্বাস করলো—ভাবলো, তাইতো কোন উপায় নেই দেবরাজকে পাবার। মালা নীরবে চোখ মুছলো।

বনহুর মালা আর মোহন্তরাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঝাম আস্তানায় এসে পৌঁছলো। ঝাম আস্তানায় পৌঁছে প্রথমেই বনহুর ওয়্যারলেসে নূরীর সন্ধান করলো।

নূরী জানে, তার বনহুর ঝাম সাগরের অতল গহ্বরে ডুবুরী বেশে অবতরণ করে ফিরে আসেনি। রহমান তাকে সব খবর জানিয়েছিলো। কিউকিলার নিহত-সংবাদও নূরী পেয়েছে। কিন্তু নূরী কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলো না তার বনহুর আর নেই। মন যেন বলছে, সে বেঁচে আছে—মরেনি।

কিন্তু একটা চিন্তা তাকে বড় অস্থির করে তুলেছিলো সত্যিই যদি বনহুরের কোন কিছু ঘটে থাকে। গভীর সাগর—কত হাঙ্গর-কুমীর, আরও কতরকম জলজীব আছে। যদি বনহুরকে নিহত করে থাকে.....কিন্তু সে যেন ভাবতেই পারতো না এ কথা। তার বনহুর মরতে পারে না, তাকে বলে গেছে—সে মরবে না। সেদিনও নূরী নিজের গুহায় বসে ভাবছে কত কথা। বিয়ের রাতেই বনহুর চলে গেছে, বলে গেছে কত কথা.....তুমি আমার জন্য ভেবো না নূরী, কিউকিলা হত্যা করেই আমি ফিরে আসবো! কিন্তু কই,.....আজ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেলো তবু ফিরে এলো না, বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই সে এতোদিন ফিরে আসতো। নূরীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়েছিলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

এমন সময় নূরীর কণ্ঠের লকেটের ওয়্যারলেসে এলো তার চির-আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠস্বর.....হয়তো অবাক হচ্ছে নূরী কণ্ঠস্বর শুনে।

নূরী নিজ কণ্ঠে লকেট ওয়্যারলেসখানা গণ্ডে চেপে ধরে উচ্ছ্বাসিত আনন্দধ্বনি করে উঠলো....হুর, আমার হুর, তুমি! .....সত্যি, আমি তোমার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি?

.....হ্যাঁ, সত্যিই আমি।

.....কোথা থেকে বলছো তুমি?

.....আমার ঝাম আস্তানা থেকে। কেমন আছো নূরী?

.....আগে বলো তুমি কেমন আছো? তবে যে রহমান বলেছিলো, তুমি নাকি সাগরতল হতে ফিরে আসোনি?

.....রহমান তোমাকে মিথ্যা বলেনি। নূরী আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। সে অনেক গল্প, এসে বলবো তোমাকে।

.....হুর তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। কতদিনে আসবে তুমি সেই প্রতীক্ষায় থাকবো।

.....অল্প কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো নূরী।

.....হুর, দেরী করবে না তো?

.....না! মোটেই না তবে যদি নতুন কোনো.....

.....কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আগে এসো তারপর সব কথা। স্মরণ রেখো তুমি কথা দিয়েছিলে, বলেছিলে—বাসর রাতে আমি তোমায় রেখে যাচ্ছি নূরী, আমি এক মুহূর্তের জন্য ভুলবো না তোমাকে। কিউকিলা হত্যা করেই ফিরে আসবো। বলো শপথ রক্ষা করবে?

.....হ্যাঁ শপথ করলাম। আচ্ছা রাখি?

আচ্ছা রাখো! খোদা হাফেজ।

নূরী উচ্ছল ঝরণার মত ছুটে গেলো নাসরিনের কক্ষে! জড়িয়ে ধরলো খুশির আবেগে তাকে, চুমোয় ভরিয়ে দিলো তার গণ্ড।

নাসরিন অবাক হলো, ব্যাপার কি! সর্দারের সাগরতলে অবতরণ সংবাদ শুনার পর থেকে নূরীকে কথা বলতে শুনেনি নাসরিন। আজ তাকে আনন্দ-মুখর দেখে সেও খুশি হলো, অবাকও হলো কিছুটা, বললো সে—নূরী, কি হয়েছে বল না!

শুভ সংবাদ! শুভ সংবাদ নাসরিন। হুর বেঁচে আছে।

সর্দার বেঁচে আছে?

হাঁ হাঁ নাসরিন। আমি জানতাম, আমার হুর মরতে পারে না।

নূরী!

নাসরিন এইমাত্র হুর ওয়্যারলেসে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু শোন্, তুই একথা আগেই কাউকে বলবি না। রহমান 'শাহী' জাহাজ নিয়ে কান্দাই ফিরে আসছে—এসে শোনবে, আগে তাকেও ওয়্যারলেসে জানাবো না।

বেশ তাই হবে। কিন্তু দাই মা, দাই মা যে সর্দারের জন্য চিন্তা করে নাজেহাল হয়ে পড়েছে।

আর ক'টা দিন হতে দে! আগে ফিরে আসুক।

নূরীর মনে অফুরন্ত আনন্দ জেগে উঠলো, আবার পাহাড়িয়া ঝর্ণার মত চঞ্চল হয়ে উঠলো সে।

❑

গভীর রাত।

ঘুম নেই নূরীর চোখে। একলা শয্যায় শুয়ে ভাবছে বনহুরের কথা। বিয়ের রাতে যে মালাটা বনহুর নূরীর কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছিল, সেই মালাটা নিয়ে বুকে চেপে ধরে নূরী অস্ফুটকণ্ঠে বলে—হুর, তুমি কবে আসবে? কখন আসবে তুমি? তোমার প্রতীক্ষায় আমি যে আকুল হয়ে যাচ্ছি.....

ঠিক সেই মুহূর্তে একখানা ছোরা এসে গেঁথে যায় নূরীর খাটের পাশে।

চমকে উঠে নূরী, তাড়াতাড়ি ছোরাখানা তুলে নিতেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে নূরীর চোখ দুটো—হুর, তুমি এসেছো!

কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর—হাঁ নূরী!

নূরী আর থাকতে পারে না, ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বনহুরের বুকে—হুর!

বনহুর নূরীকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে।

বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে আনন্দ-অশ্রু বিসর্জন করে নূরী।

বনহুর নূরীর চিবুকটা তুলে ধরে ডাকে—নূরী!

বলো?

সত্যি যদি সাগরতলে আমার সমাধি হতো তাহলে কি করতে?

নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়—ওকথা বলো না হুর। ওকথা বলো না।

যে বিপদে পড়েছিলাম তাতে ফিরে আসা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। ভাগ্যিস, জীম্‌স মীরা আমাকে সাহায্য করে, তাই ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছি।

জীম্‌স মীরা!

হাঁ, ইরানের রাজকুমারী।

অবাক হয়ে বললো নূরী—গভীর সাগরতলে ইরান রাজকুমারী তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিলো?

যায়নি; সে ওখানেই ছিলো।

সাগরতলে.....

হাঁ নূরী।

বুঝেছি, সেই কারণেই তুমি ভুলে গিয়েছিলে সব কথা। তোমার আস্তানার কথাও.....অভিমান করে পড়ে নূরীর কণ্ঠে।

বনহুর হেসে বলে—চলো নূরী, সব বলছি তোমাকে।

চলো।

নূরী আর বনহুর খাটের পাশে এসে দাঁড়ায়।

বনহুর মাথার পাগড়ীটা খুলে রাখে। নূরী ওর জামার বোতাম খুলে দেয়। পা থেকে ভারী বুটখানাও খুলে দেয় নূরী নিজের হাতে।

বনহুর শয্যায় উঠে বসে টেনে নেয় নূরীকে কাছে। নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

নূরী বলে—কই বললে না তোমার সাগরতলের বিস্ময় কর ঘটনা?

বলবো।

তবে বলো?

শোন.....বনহুর বলতে শুরু করে, সাগরতলের সমস্ত ঘটনাগুলো বলে যায় সে নূরীর কাছে।

সমস্ত ঘটনা শোনার পর নূরী বলে উঠে—জীম্‌স মীরার অপরূপ সৌন্দর্য তোমাকে মোহগ্রস্ত করে ফেলেছিলো বনহুর।

বনহুর নূরীর ললাট থেকে কুঞ্চিত কেশগুলো আংগুল দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বলে—ঠিক মোহগ্রস্ত নয়, কতকটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম—

তাহলে কেন তুমি তাকে গ্রহণ করলে না? নূরীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

হঠাৎ হেসে উঠে বনহুর অদ্ভুতভাবে, তারপর চীৎ হয়ে শুয়ে পড়ে শয্যায়, শিথিল কণ্ঠে বলে—আরজ আমাকে চিনতে পারো নি বলে আফসোস্ নূরী। তুমি নিজেকে দিয়েও কি আমাকে উপলব্ধি করনি? বনহুর নূরীর চিবুকটা উঁচু করে ধরে।

নূরীর মুখ ধীরে ধীরে প্রসন্ন হয়ে আসে। বনহুরের সঙ্গে পূর্বের দৃশ্যগুলো ভেসে উঠে তার মনের পর্দায়। নূরী অস্ফুট শব্দ করে বনহুরের বুকে মুখ লুকায়—হুর, আমাকে ক্ষমা করো।

বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে, আবেগভরা কণ্ঠে বলে—নূরী!

বলো?

বাসর রাতে তোমাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলাম বলে আমার উপর অভিমান করেছিলে, না?

হুর, আমি কোনোদিন তোমার উপর অভিমান করে থাকতে পারবো না।

আমি জানি। আর জানি বলেই তোমাকে আমার এত বিশ্বাস। নূরী, আজ আমাদের সেই বাসর রাত। কই, ফুলের মালাটা কই, দাও পরিয়ে দিই আজ আবার নতুন করে!

নূরী সেদিনের শুকনো মালাগাছা বনহুরের হাতে তুলে দেয়।

বনহুর নূরীর কণ্ঠে পরিয়ে দেয় ওটা, তারপর গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে।

নূরী ওকে বাধা দেয় না, মাথা রাখে বনহুরের বুকে।

বনহুর হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয়।

অনেক দুঃখ-বেদনা আর মনোকষ্ট নিয়ে রহমান দলবলসহ ফিরে আসে আস্তানায়। কিন্তু আস্তানায় ফিরে যখন শুনতে পেল, সর্দার জীবিত আছেন এবং তিনি তার পূর্বেই ফিরে এসেছেন তখন আনন্দে আত্মহারা হলো। আনন্দের আতিশয্যে ছুটে গিয়ে সর্দারকে বুকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে বললো—সর্দার.....আপনি জীবিত আছেন!

বনহুরও নিজেকে অতিকষ্টে সংযত রেখে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—রহমান, খোদার অসীম দয়া আর তোমাদের অফুরন্ত ভালবাসা আমাকে ভয়ঙ্কর মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে।

সর্দারের বুকে বুক মিলিয়ে রহমান অসীম আনন্দ আর তৃপ্তি বোধ করে! এতো খুশি বুঝি কোনোদিন হয়নি সে তার জীবনে।

বনহুরের আস্তানা আবার উচ্ছল আনন্দে ভরে উঠে।

হাসি আর গানে মুখর হয়ে উঠে নূরী।

এতো আনন্দ আর খুশি নূরীর জীবনে এই প্রথম। কয়েকদিন নূরী আর বনহুর আস্তানায় মেতে রইলো—কখনও বা ঝরনার ধারে, কখনও জঙ্গলে, কখনও বা পাহাড়ের উপরে, কখনও ঘোড়ায় চেপে দু'জন দু'জনাকে নিয়ে আত্মহারা।

বনহুর বসে থাকে কোনো উঁচু পাথরে, নূরী ফুলে ফুলে ফুলরাণী সেজে নাচ দেখায়। কখনও নাগিনীকন্যা রূপ, কখনও ভীল বালা সেজে। বনহুর মৃদু মৃদু হাসে, কখনও বা হাত তালি দিয়ে নূরীকে উৎসাহ দেয়। কোনো

কোনোদিন উঁচু পাহাড়ে উঠে দু'জন হাত ধরে ধরে চলতে থাকে। গান গায় নূরী, বনহুর শীস দেয়—অপূর্ব এক অনুভূতি নাড়া দিয়ে উঠে নূরীর মনে।

বনহুরকে পেয়ে নূরীর জীবন সার্থক হয়।

বনহুর আর নূরী একদিন পাহাড়িয়া অঞ্চলের ধার ধরে কান্দাই-এর জঙ্গলে ফিরছিলো। তাজের লাগাম ধরে এগুচ্ছিলো বনহুর।

নূরী চলেছিলো তার ঠিক পাশে পাশে।

নূরীর পরনে ঘাগ্‌ড়া, গায়ে কামিজ, চুলগুলো বেণী করে কাঁধের দু'পাশে ঝুলানো। নূরী চঞ্চল হরিণীর মত ছুটে ছুটে চলছিলো।

বনহুর আপন মনে চলছে আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে দূরে ভীল পল্লীটার দিকে।

আর কিছুটা পথ এগিয়ে ওরা দু'জন অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসবে, সন্ধ্যা হয় হয় অবস্থা—দ্রুত পা চালাচ্ছিলো বনহুর আর নূরী।

এমন সময় একটা ছোট্ট বালকের কান্নার শব্দ ভেসে আসে ভীল পল্লী থেকে, করুণ সে কান্নার আওয়াজ—বাপু....বাপু.....হামার বাপু কই গেলো....বাপু.....

থমকে দাঁড়িয়েছিলো বনহুর, মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে গেলো , তাকালো সম্মুখে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ভীল পল্লীর দিকে। বনহুরের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো একটি কচিমুখ—সরল-সচ্ছ দু'টি চোখ। ব্যাকুল কণ্ঠে সে যেন ডাকছে—আব্বু, আব্বু, তুমি কোথায় আব্বু.....

নূরী বনহুরের আনমনা ভাব লক্ষ্য করে বললো—কি ভাবছো হুর?

কিছু না! চলো নূরী যাই.....

জানি তুমি যা ভাবছো!

সত্যি কতদিন নূরকে দেখিনি, তাই....

বেশ তো, আজ গিয়ে ওকে দেখে এসো। আর শোনো, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। আমিও কতদিন আমার মনিকে দেখিনি। নূরীর কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। একটু থেমে বলে—চলো না হুর, আজ রাতেই যাবো সেখানে!

কিন্তু তোমাকে নিয়ে অসুবিধে হবে নূরী।

যতো অসুবিধেই হউক শোনবো না তোমার কোনো কথা। আমাকে নিয়ে যেতেই হবে তোমাকে।

নূরী, বড্ড অবুঝ হচ্ছো।

না, আমি অবুঝ নই। বলো তবে কেন তুমি মনিকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে মনিরা আপাকে দিলে? বলো—বলো কেন মনিকে কেড়ে নিলে আমার বুক থেকে.....নূরী দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো উচ্ছ্বসিতভাবে।

বনহুর নূরীকে কাছে টেনে নিলো, স্নেহভরা কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—দুঃখ করো না নূরী, মনি তো তোমারই।

না, আমার নয়। আমার হলে সে আমার কাছেই থাকতো। তুমি তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে.....

নূরী, লক্ষ্মীটি কেঁদো না।

বলো, মনির মতো আমাকেও একটি শিশু এনে দেবে?

হাসলো বনহুর মুখ টিপে, তারপর শান্ত কণ্ঠে বললো—দেবো।

বনহুরের কথায় আশ্বস্ত হলো নূরী—সে জানে, বনহুর কখনও মিথ্যা কথা বলে কাউকে সান্ত্বনা দেয় না। যা সে বলে তাই করে, জীবন দিয়েও পূর্ণ করে বনহুর।

নূরীর মুখ দীপ্ত হয়ে উঠলো।

বনহুর খুশি হলো মনে মনে, এবার সে নূরীকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে নিজেও চেপে বসলো। তাজ প্রভুর ইংগিত বুঝতো, বনহুর চেপে বসতেই উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

কান্দাই আস্তানায় পৌঁছে নূরীকে অশ্বপৃষ্ঠ হতে নামিয়ে নিয়ে বললো বনহুর—তুমি থাকো নূরী, আমি মনির সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসবো।

যাও, কিন্তু সাবধানে যেও।

বনহুর লাফ দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো, হাত তুলে বললো—খোদা হাফেজ।

লাগাম টেনে ধরতেই তাজ সম্মুখের পা দু'খানা উঁচু করে চিঁহি চিঁহি করে উঠলো, তারপর ছুটলো উল্কাবেগে।

বনহুর যখন তাজের পিঠে চেপে কান্দাই শহর অভিমুখে চলেছে তখন সমস্ত পৃথিবী নিদ্রায় অচেতন। নির্জন পথে শুধু জেগে উঠছে তাজের মুখের শব্দ খট্ খট্ খট্। পথের দু'পাশে শাল আর দেবদারু গাছের ফাঁকে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে রাতজাগা পাখীর থমথমে কণ্ঠ। আকাশে অসংখ্য তারার মালা, বাতাস বইছে এলোমেলো।

তাজের পিঠে উল্কাবেগে ছুটছে বনহুর।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বনহুর পৌঁছে গেলো চৌধুরী বাড়ির অদূরে।

গভীর নিস্তব্ধ রাত।

তাজের পিছ থেকে নেমে পড়লো বনহুর। তারপর পিছন প্রাচীর টপ্‌কে প্রবেশ করলো ভিতর বাড়িতে। চুপি চুপি পাইপ বেয়ে কৌশলে উঠে গেলো উপরে। যে পথে বনহুর মনিরার ঘরে প্রবেশ করতো, আজও সেই পথে প্রবেশ করে তাকায় বনহুর কক্ষমধ্যে। ডিম্‌লাইটের আলোতে বনহুর স্পষ্ট দেখতে পায়—মনিরা তার বিছানায় নিদ্রায় অচেতন। বুকের উপরে পড়ে আছে একখানা হাত, হাতখানার মধ্যে একটি ছবি রয়েছে।

বনহুর নিকটবর্তী হয়ে ঝুঁকে মনিরার হাতের মধ্য থেকে অতি সন্তর্পণে ছবিখানা তুলে নেয়, বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখে—সেটা তারই ছবি। অনুশোচনা আর ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠে তার হৃদয়, চোখ দুটো ছলছল করে উঠে, অপরাধীর মত সরে দাঁড়ায়। আবার বনহুর ফিরে তাকায় মনিরার নিদ্রিত মুখমণ্ডলের দিকে। নিজকে স্থির রাখতে পারে না সে, বসে পড়ে মনিরার পাশে, দক্ষিণ হস্তখানা রাখে ওর কপালে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে যায় মনিরার। আচম্‌কা জেড়ে উঠে স্বামীর স্পর্শে। নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারে না।

বনহুর মনিরার বিস্ময় ভাব লক্ষ্য করে বলে—মনিরা, আমি এসেছি! ভালো করে তাকায় বনহুর মনিরার মুখের দিকে, কেমন যেন রুক্ষ আর করুণ লাগছে!

বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় দু'টি বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে।

সম্বিৎ ফিরে আসে মনিরার, অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে—কেন, এলে তুমি? যাও, চলে যাও। মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য চেষ্টা করে।

বনহুর আবেগভরা কণ্ঠে ডাকে—মনিরা!

তুমি আমার নাম ধরে ডেকো না। আমি তোমার কেউ নই।

ক্ষমা করো মনিরা। তোমার অপরাধী স্বামীকে ক্ষমা করো।

মনিরা তখন বনহুরের পাশ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অনেকগুলো দিনের জমানো ব্যথা আজ ঝরে পড়ছে বর্ষাধারার মতো তার দু'নয়ন বেয়ে।

বনহুর মনিরার দিকে এগিয়ে যায় যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো, কোমল কণ্ঠে বলে—মনিরা, আজ নতুন নয়—তুমি তো জানো, আমার কত কাজ! কথাটা বলে বনহুর মনিরাকে ধরতে যায়।

মনিরা ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস করে উঠে—না, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না।

মনিরা।

কোনো কথাই আমি শুনতে চাই না তোমার।

মনিরা শোনো।

বলছি তুমি চলে যাও। আর কোনোদিন তুমি আসবে না আমার ঘরে।

ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি!

না। আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। কোনো স্বামী এমনি করে দিনের পর দিন ভুলে থাকে তার স্ত্রীকে? কোনো পিতা সন্তান ত্যাগ করে চলে যায় দূরে—বহু দূরে? বলে, বলো—বলো কোনো ব্যক্তি এমনি নির্মম আর নিষ্ঠুর হয়? ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও আমাকে——মনিরা দাঁত দিয়ে বনহুরের হাত কামড়ে দেয়। নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে ওর জামার অংশ।

বনহুর তবু মনিরাকে মুক্ত করে দেয় না, ব্যথা-করুণ এক-খণ্ড হাসি ফুটে উঠে বনহুরের ঠোঁটের কোণে, বলে—যা খুশি করো, কামড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলো, আমি বাধা দেবো না তোমাকে।

মনিরার দাঁতের আঘাতে বনহুরের হাত কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। সুন্দর বলিষ্ঠ লোমশ বাহুটা রাঙা হয়ে উঠে, তবু নীরব বনহুর। দীপ্ত হাস্যোজ্জ্বল তার মুখমণ্ডল।

সরে দাঁড়ায় মনিরা।

বনহুর হাতখানা রাখে পাশের চেয়ারের উপর।

হঠাৎ মনিরার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বনহুরের হাতের উপর, চমকে উঠলো মনিরা—রক্তে লাল হয়ে গেছে বনহুরের হাত-খানা। কিছুতেই নিজকে স্থির রাখতে পারলো না, ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো স্বামীর বুকে।

বনহুর মনিরাকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো।

মনিরা ওর রক্তরাঙা হাতখানা চোখের সম্মুখে তুলে ধরে কেঁদে উঠলো—একি করেছি আমি!

মনিরা, এ ব্যথা তোমার বুকের ব্যথার চেয়ে অনেক কম। আমি জানি, সব বুঝি মনিরা কিন্তু আমি পারি না তোমাকে খুশি করতে। তাই আমাকে তুমি ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলো, আমি তোমার দেওয়া কষ্ট নীরবে গ্রহণ করবো.....

না না,. এ আমি কি করেছি! এ আমি কি করেছি! স্বামীকে খাটের উপর বসিয়ে দিয়ে ছুটে যায় মনিরা, ঔষধ এনে ক্ষতে লাগিয়ে কাপড় জড়িয়ে বেঁধে দেয় যত্ন করে। তারপর স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলে—এতটা কেটে গেছে তবু তুমি একটুও শব্দ করোনি। আমাকে তুমি ক্ষমা করো না যেন!

মনিরা! আবেগভরা কণ্ঠস্বর বনহুরের।

মনিরা ভুলে যায় সব মান-অভিমান, শান্ত কণ্ঠে বলে—বলো?

নূর কোথায় মনিরা?

মায়ের ঘরে ঘুমাচ্ছে।

ওকে দেখতে পাবো না একবার?

পাবে! ওগো পাবে! নূর যে তোমারই সন্তান।

মনিরা, নূর কত বড় হয়েছে?

বেশ বড় হয়েছে। পড়াশোনায় অত্যন্ত ভালো।

আঃ কি আনন্দ হচ্ছে আমার। নূর পড়াশোনা করে মানুষের মত মানুষ হবে———

মনিরা বলে উঠে—ও সব সময় তোমার কথা বলে।

উচ্ছল আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে বনহুর, ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—কি বলে সে?

বলে, আম্মি আমার আব্বু কোথায়? কবে আসবে, কখন আসবে, এমনি আরও কত প্রশ্ন করে।

তুমি তাকে কি জবাব দাও মনিরা?

নূর যখন তোমার কথা জিজ্ঞেস করে তখন আমি পারি না তার প্রশ্নের জবাব দিতে। কান্না পায় আমার, কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। বলো কি জবাব দেবো?

বলবে তোমার আব্বু মরে গেছে....

বনহুরের কথা শেষ হয় না, মনিরা তার মুখে হাতচাপা দেয়।

বনহুর মনিরার হাতখানা দক্ষিণ হস্তের মুঠায় চেপে ধরে বলে—তোমার জীবনে হয়তো বেঁচে থাকতে পারি কিন্তু নূরের জীবন থেকে আমি মরে যেতে চাই মনিরা।

অমন অমঙ্গলজনক কথা তুমি বলো না।

মনিরা! আমার মনিরা!

মনিরা তখন স্বামীর প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে চোখ দুটো বন্ধ করে।

❑

ঘুমন্ত নূরের কপালে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় বনহুর। নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে পুত্রের মুখের দিকে।

মরিয়ম বেগম পাশের কক্ষে নামাজ পড়ছিলো, সেই ফাঁকে মনিরা স্বামীকে নিয়ে প্রবেশ করেছিলো মামীমার কক্ষে। ভোর হবার পূর্বেই বনহুর উঠে পড়েছিলো, কান্দাই নগর জনমুখর হয়ে উঠার পূর্বেই সে ফিরে যাবে তার আস্তানায়। নূরকে দেখেই সে চলে যাবে।

বনহুর আর মনিরা ফিরে আসে নিজের ঘরে।

বিদায় মুহূর্তে বনহুর মনিরাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলে—মনিরা, তুমি যেন আমাকে ভুল বুঝবে না। যখনই সুযোগ পাবো,চলে আসবো তোমার কাছে।

সত্যি আসবে তো?

আসবো।

ঠিক সেই সময় শোনা যায় নূরের কণ্ঠ—আম্মি, আম্মি....

মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সরে দাঁড়ায়—আসছি বাবা।

ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে বনহুর মুক্ত জানালা দিয়ে।

নূর মায়ের কক্ষে প্রবেশ করে বললো—আম্মি, কে যেন কথা বললো তোমার ঘরে?

কই, কেউ না তো বাবা! এসো আমার কাছে। মনিরা সন্তানকে টেনে নেয় কোলের কাছে। কিন্তু তার দৃষ্টি চলে যায় মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরে। ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করে নিচের দিকে।

নূর বলে—কি দেখছো আম্মি?

কিছু না। চলো তোমার হাতমুখ ধুয়ে দিইগে।

মনিরা সন্তানসহ চলে যায় বাথরুমের দিকে।

ওদিকে বনহুরের অশ্ব তখন কান্দাই শহর অতিক্রম করে আস্তানা অভিমুখে এগিয়ে চলেছে।

ফিরে এলো বনহুর আস্তানায়।

তাজের পিঠ থেকে নেমে পড়তেই দু'জন অনুচর তাজের লাগাম ধরে তাজকে অশ্বশালার দিকে নিয়ে গেলো।

বনহুর এগিয়ে চললো সুড়ঙ্গপথে নিজ বিশ্রামাগারের দিকে।

বিশ্রামাগারে প্রবেশ করতেই নূরী এসে দাঁড়ালো—হুর, এসে গেছো? মনিরা আপা আর নূর কেমন আছে?

বনহুর কোমরের বেল্ট থেকে গুলিভরা রিভলভারখানা রাখলো টেবিলে, তারপর আসনে উপবেশন করে বললো—ভালই আছে ওরা।

হঠাৎ নূরীর দৃষ্টি বনহুরের হাতের ব্যাণ্ডেজে গিয়ে আটকে পড়লো, তাড়াতাড়ি হাতখানা নিজের হাতের উপর তুলে নিয়ে বললো—কি হয়েছে? কি করে কেটে গেলো তোমার হাতখানা?

চট্ করে কোনো জবাব দিতে পারলো না বনহুর, একটু ভেবে বললো—কেটে গেছে।

কেটে গেছে! কিন্তু কি করে কাটলো?

ও কথা বলো না, হঠাৎ কেমন করে কাটলো একটুও টের পাইনি।

নূরী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—তোমার হাতের ব্যাণ্ডেজখানা রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে আর বলছো কেমন করে কেটে গেলো একটুও টের পাওনি? কি ভয়ঙ্কর মানুষ তুমি?

নূরীর কথায় হেসে বললো বনহুর—নতুন করে আজ এটা আবিষ্কার করলে নূরী?

অভিমান ভরা গলায় বললো নূরী—জানি তুমি অদ্ভুত মানুষ কিন্তু এতোখানি সংজ্ঞাহীন তা জানতাম না।

বনহুর বললো—সামান্য কেটেছে, এ নিয়ে ভাবার কিছু নেই নূরী। চলো ঝরণার ধারে যাই। মুক্ত বাতাসে শরীরটা শীতল হবে।

এমন সময় কক্ষের বাইরে কারো পদশব্দ শোনা যায়।

পরক্ষণেই শোনা যায় রহমানের ব্যস্ত কণ্ঠস্বর—সর্দার।

বনহুর বলে উঠলো—এসো। ভিতরে এসো।

হন্তদন্ত হয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে রহমান—পিছনে কায়েস আর গোরী আস্তানার একজন অনুচর—নাম তার সোনা মিয়া। রহমান, কায়েস এবং সোনা মিয়ার চোখেমুখে উত্তেজনার ভাব বিদ্যমান।

বনহুর কিছু বলার পূর্বেই বলে রহমান—সর্দার, সর্বনাশ হয়েছে, আমাদের গোরী আস্তানা লুট হয়েছে।

বনহুর আসনে বসেছিলো রহমানের কথা শুনে দ্রুত উঠে দাঁড়ায়, চোখেমুখে ফুটে উঠে বিস্ময় আর ক্রুদ্ধ ভাব। হুঙ্কার ছাড়ে—গোরী আস্তানা লুট হয়েছে?

এবার কথা বললো সোনা মিয়া—হাঁ সর্দার।

বনহুরের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হয়, কঠিন হয়ে উঠে তার সুন্দর দীপ্ত মুখমণ্ডল বলে উঠে—কিভাবে এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো সোনা?

সর্দার, আজ গভীর রাতে একদল দুধর্ষ দস্যু হামলা দিয়ে সব লুট করে নিয়ে গেছে আর কয়েকজনকে হত্যাও করেছে তারা।

আর তোমরা কি করছিলে?

আচম্বিতে আক্রমণ করায় আমরা প্রস্তুত ছিলাম না সর্দার।

সোনা, জানো না আমার আস্তানার অনুচরগণ কোনো সময় অপ্রস্তুত থাকতে পারে না? গোরীর সর্দার বীর সিং কোথায় ছিলো?

সোনা মাথা নিচু করে রইলো, কোন জবাব দিলো না।

বনহুর পুনরায় গর্জে উঠলো-বীর সিং কোথায় ছিলো কাল রাতে?

সর্দার----

বলো কি বলতে চাও?

বীর সিং তার বিশ্রামাগারে ছিলো।

বিশ্রামাগারে নিদ্রায় অচেতন ছিলো?

না সর্দার।

তবে?

সোনা মিয়া অসহায় চোখে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে, কিছু যেন বলতে চায় কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।

বনহুর ধমকে উঠলো—নেকামি করছো কেন? যা বলার বলো। আমি আজই গোরী আস্তানা অভিমুখে রওনা দেবো। তারপর সব শুনবো নিজ কানে।

এবার বললো সোনা মিয়া—বীর সিং নেশা পান করে বিভোর হয়েছিলো সর্দার।

এর পূর্বেও আমি শুনেছি বীর সিং নেশাই পান করে না, আরও এমন অনেক কাজ সে করে যা আমার অগোচর নেই। একবার নয়, কয়েকবার আমি তাকে ক্ষমা করেছি কিন্তু এবার আমি তার সমুচিত শাস্তি দান করবো।

একসঙ্গে রহমান এবং সোনা মিয়া কেঁপে উঠলো। শিউরে উঠলো তাদের হৃদয়, জানে তারা—সর্দারের শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড।

কম্পিত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সোনা মিয়া সর্দারের দিকে।

বনহুর বললো—রহমান গোরী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। আমি গোরীর সর্দার বীর সিং এবং আমার আস্তানা লুটকারীদের উপযুক্ত সাজা দেবো।

নূরীও শিউরে উঠলো, একটা আতঙ্কের ছায়া ছিলো তার মুখে। না জানি আবার হুর কোন্ বিপদের সম্মুখীন হয় কে জানে।

সোনা মিয়া আর রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

রহমান সংকেতধ্বনি করে আস্তানার সমস্ত অনুচরকে একত্রিত করলো, তারপর জানিয়ে দিলো সর্দারের আদেশটা।

রহমান আর সোনা মিয়া বেরিয়ে যেতেই বনহুর চিন্তিতভাবে পায়চারী শুরু করলো। তার মুখমণ্ডলে গভীর উদ্বিগ্নতার রেখা ফুটে উঠলো।

নূরীও এই মুহূর্তে কোনো কথা বলার সাহসী হলো না। একটু পূর্বেই যে বনহুরের সঙ্গে সচ্ছ স্বাভাবিকভাবে আলাপ-আলোচনা করছিলো এখন সে যেন সরে গেছে অনেক দূরে। বনহুরের দিকে তাকিয়ে রইলো নূরী নির্বাক দৃষ্টি নিয়ে।

❑

গোরী পার্বতের গহ্বরে ছিলো বনহুরের গোরী আস্তানা। এখানে বনহুরের প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন অনুচর থাকতো। এই সব অনুচরকে পরিচালনা করার জন্য ছিলো সর্দার বীর সিং—এক হিন্দু লোক।

কান্দাই এর দক্ষিণে প্রায় একশত মাইল দূরে এই গোরী পর্বত। গোরী হিন্দুপ্রধান দেশ, তাই গোরী আস্তানার বনহুরের প্রায় সবগুলো অনুচর হিন্দু ছিলো, দু'চারজন ছিলো মুসলমান।

সোনা মিয়া তাদেরই একজন।

হিন্দু হলেও গোরী আস্তানার অনুচরগণ সবাই ছিলো বনহুরের অত্যন্ত বিশ্বাসী আর অনুগত। গোরী পর্বত এলাকার বহু লোকের বাস ছিলো। এইসব অঞ্চলের লোকজন ছিলো অত্যন্ত দুর্দান্ত আর জঘন্য। এরা সুযোগ পেলেই দলবদ্ধ হয়ে গোরী নগরে প্রবেশ করে নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করতো এবং তাদের সব লুটপাট করে নিতো। নারীদের হরণ করে নিয়ে যেত। বনহুর এইসব লম্পট শয়তানকে দমন করার জন্যই গোরী পর্বতে একটি আস্তানা গড়ে তুলেছিলো।

বনহুরের এই আস্তানার নাম ছিলো গোরী আস্তানা। বীর সিং এই আস্তানার সর্দার বানিয়ে বনহুর নিশ্চিন্ত ছিলো।

কিন্তু কিছুদিন হলো বীর সিং ভিতরে ভিতরে নারী ও নেশা পানে মেতে উঠেছিলো। প্রায়ই সে এখানে-সেখানে অন্যায়ভাবে হানা দিয়ে নারী হরণ করে আনতো এবং চালাতো ব্যভিচারী অত্যাচার।

বনহুরের কানে তেমনভাবে এ সংবাদ না গেলেও কিছুটা সে জানতে পেরেছিলো। কিন্তু যখন বনহুর বীর সিং সম্বন্ধে জেনেছিলো তখন সে কিউকিলা হত্যা ব্যাপার নিয়ে আত্ম-ভোলা হয়ে পড়েছিলো।

আজ বনহুর যখন গোরী আস্তানা লুটের সংবাদ পেলো তখনই তার মনে পূর্বকথা স্মরণ হলো এবং অনুমানে বুঝে নিলো বীর সিং এর জন্যই আজ এই ঘটনা ঘটেছে।

বনহুর তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর এবং রহমানসহ গোরী আস্তানায় এসে হাজির হলো।

বীর সিং-এর হৃদয় কেঁপে উঠলো সর্দারের আগমনে।

বনহুর আস্তানায় পৌঁছতেই তার প্রত্যেকটা অনুচর এসে করজোরে দণ্ডায়মান হলো। সকলেই চোখেমুখে এক ভয় বিহ্বল ভাব।

এক পাশে মাথা নত করে দাঁড়িয়েছে বীর সিং ঠিক অপরাধীর মত।

বনহুর আসনে উপবেশন না করে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাকালো তার প্রত্যেকটা অনুচরের দিকে। দৃষ্টি এসে স্থির হলো বীর সিং-এর মুখে।

বীর সিং তখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছিলো হয়তো, বনহুর বজ্রকঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠলো—বীর সিং।

চমকে মুখ তুললো বীর সিং, শুষ্ক কণ্ঠে বললো—সর্দার।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো—কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে?

সর্দার, আমি—আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম---

বীর সিং-এর কথার মাঝখানে বলে উঠে বনহুর—আর সেই সুযোগে গোরীদস্যু হানা দিয়ে সব লুটে নিয়ে গেছে, তাই না?

সর্দার, হাঁ—সেই মতই হয়েছে।

বীর সিং, আমি গোরী আস্তানায় না এলেও তোমার সম্বন্ধে সব অবগত আছি। তুমি কখন কোন মুহূর্তে কি করছো সব আমি জানি।

সর্দার, আপনি হয়তো আমার সম্বন্ধে-----

ভুল শুনেছি তাই না?

মাথা নত করে থাকে বীর সিং কোনো জবাব দেয় না।

বনহুর বুট দিয়ে মাটিতে আঘাত করে—বীর সিং, তোমার নিজের মুখে শুনতে চাই, তুমি গতরাতে কোথায় ছিলে এবং কি করছিলে? যার জন্য গোরী দস্যু আমার আস্তানায় হানা দেবার সুযোগ পেলো?

আস্তানায় দরবার স্থান থমথমে নীরব। বনহুরের গম্ভীরকণ্ঠের প্রতিধ্বনি গোরী পর্বতের গুহাকে প্রকম্পিত করে তোলে। বীর সিং নিজকে রক্ষা করার উপায় খুঁজে। সে ভাবতেও পারেনি সর্দার স্বয়ং এসে হাজির হবে। বিনীত করুণ কণ্ঠে বললো বীর সিং—সর্দার, আমি আস্তানার বাইরে গিয়েছিলাম।

আবার মিথ্যা কথা? বনহুর উচ্চকণ্ঠে ধমক দিলো।

সোনা মিয়া তার একজন অনুচরকে ইঙ্গিত করলো।

অনুচরটি বেরিয়ে গেলো তৎক্ষণাৎ।

একটু পরে ফিরে এলো লোকটা আরও দু'জন অনুচর ও একটি তরুণীসহ। অনুচরদ্বয়ের নাম দেলওয়ার আর বলরাম। তরুণীর দু'বাহু দু'জনা ধরে ছিলো শক্ত করে।

বনহুর তাকালো তরুণীর দিকে।

তরুণী গোরীবাসিনী তাতে সন্দেহ নেই। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। সুন্দরী বটে মাথায় চুল এলোমেলো, ছিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত বসন। জামার অংশ ছিঁড়ে গেছে স্থানে স্থানে, আঁচলখানা ভুলুণ্ঠিত। চোখে কালিমা পড়েছে মুখে কয়েক স্থানে ক্ষত চিহ্ন। উন্মাদিনীর মত চাহনী।

সোনা মিয়া, দেলওয়ার ও বলরাম তরুণীটি সহ যখন দরবার কক্ষে প্রবেশ করলো তখন দরবারকক্ষই শুধু কেঁপে উঠলো না, কেঁপে উঠলো দরবারকক্ষের প্রতিটি অনুচররের হৃদয়।

বীর সিং-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, ফাঁসীর মঞ্চের আসামীর মত রক্তশূন্য দেখাচ্ছে তাকে। একবার তরুণীর দিকে তাকিয়ে মাথাটা নত করে নিলো।

বনহুর তরুণীর পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিলো নিপুণ দৃষ্টি মেলে।

তরুণী দাঁত দিয়ে অধর দংশন করছিলো আর ক্রুদ্ধ নজরে তাকাচ্ছিলো অদূরে দণ্ডায়মান বীর সিং-এর দিকে।

বনহুর বললো—বীর সিং, কে এই তরুণী?

বীর সিং বাধ্য হয়ে তাকালো আবার তরুণীর দিকে কিন্তু কোনো জবাব দিতে পারলো না, সে ভাবতেও পারেনি, সর্দার আস্তানা লুটের সংবাদ পেয়ে চলে আসবে আর এসে তারই বিচার নিয়ে মেতে উঠবে। বীর সিং পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চুপ হয়ে।

বনহুর গর্জে উঠলো আবার—বীর সিং, জবাব দাও কে এই তরুণী?

তরুণীই চিৎকার করে বলে উঠলো—আমি, আমি গোরীর এক ব্রাহ্মণ কন্যা। বাবাকে বন্দী করে মাকে হত্যা করে ঐ শয়তান আমাকে হরণ করে এনেছে। আমার সবকিছু ঐ শয়তান কেড়ে নিয়েছে----আমার সতীত্ব নষ্ট করেছে ও ---

বনহুর নিজ দৃষ্টিটা ক্ষণিকের জন্য নত করে নেয়, হয়ত বা অনুচরদের সম্মুখে তার লজ্জাবোধ হয়। তারপর ফিরে তাকায় বীর-সিং এর দিকে—ওর কথা সত্য না মিথ্যা?

বীর সিং মরিয়া হয়ে ঢোক গিলে জবাব দিতে চেষ্টা করে—সর্দার, ও মিথ্যা বলছে---

খবরদার মিথ্যা বলো না বীর সিং, আমার আদালত নেই যে তোমার সত্য উদ্ঘাটনের জন্য উকিল নিযুক্ত করবো। আমার কারাগার নেই যেখানে তোমাকে বন্দী করে রাখবো। আমার বিচার বাদী আর বিবাদী শুধু দু'জনাকে নিয়ে। বিচার শেষে হয় মুক্তি নয় মৃত্যু।

চমকে মুখ তোলে বীর সিং—সর্দার, আমাকে ক্ষমা করুন।

ক্ষমা! হাঃ হাঃ হাঃ, অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো বনহুর। তারপর হাসি থামিয়ে বললো—যে অপরাধ তুমি করেছো তার ক্ষমা নেই বীর সিং। গোরী আস্তানা লুট হয়েছে আফসোস নেই, কিন্তু ঐ অসহায় তরুণীর ইজ্জৎ লুটে নেবার কি অধিকার ছিলো তোমার? বীর সিং তোমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

বীর সিং ছুটে এসে বনহুরের পা দু'টি চেপে ধরলো—আমাকে ক্ষমা করুন সর্দার---

বনহুর বাম হস্তে বীর সিং-এর চুল মুঠি করে ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হস্তে ছোরাখানা সমূলে প্রবেশ করিয়ে দিলো ওর তলপেটে।

তীব্র একটা আর্তনাদ করে ভূতলে পড়ে গেলো বীর সিং। তাজা লাল টক্‌টকে রক্তে ভিজে উঠলো গোরী আস্তানার মেঝের খানিকটা অংশ। বলির পাঠার মত চীৎ হয়ে পড়ে ছট্‌ফট করতে লাগলো সে।

আস্তানার প্রত্যেকটা অনুচর থরথর করে কেঁপে উঠলো কিন্তু কারো মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের হলো না।

তরুণীটি বীর সিং-এর অবস্থা দেখে প্রথমে ভীত হয়ে পড়েছিলো, পরে হেসে উঠে খিল খিল করে। বীর সিং-এর দেহটা যখন নীরব হয়ে গেলো তখন তরুণী এগিয়ে গিয়ে বনহুরের পা আঁকড়ে ধরলো—আপনি দেবতা না মানুষ? আপনি কে? আমার রক্ষণকারী আপনি---

বনহুর তরুণীকে নিজ হাতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো—আমি একজন মানুষ। বলো এখন আমি তোমাকে কোথায় পৌঁছে দেবো?

তরুণীর চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠলো, বললো—আমার বাবা ব্রাহ্মণ। আমাকে বাবা গ্রহণ করলে সমাজ তাঁকে ত্যাগ করবে। এখন আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছি না কোথায় যাবো। বাবাকে সমাজ স্থান না দিলে না খেয়ে মরবেন তিনি। কারণ আমার বাবা পূজোরী ব্রাহ্মণ। এখানে-সেখানে পূজো-পার্বণ করে যা পান তা দিয়েই তাঁর জীবন রক্ষা পায়।

তোমার বয়স তো কম মনে হয় না কিন্তু আমি জানি হিন্দু সমাজের মেয়েদের কম বয়সেই বিয়ে হয়।

আপনি যা বলেছেন সত্য, কিন্তু আমাদের সমাজে কন্যাদায় অত্যন্ত কঠিন। অর্থের অভাবে আজও আমার বিয়ে হয়নি।

বনহুর একটু শব্দ করলো—হুঁ। তারপর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—তরুণীকে নিয়ে যাও। ওকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাওগে।

আচ্ছা সর্দার।

রহমান তরুণীসহ বেরিয়ে যায়।

বনহুর এবার তার অন্যান্য অনুচরকে লক্ষ্য করে বললো—তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও, আমি গোরীদস্যুদের সমুচিত শাস্তি দেবো, তারপর ফিরে যাবো কান্দাই।

কথাটা বলে তখনকার মত বনহুর দরবারকক্ষ ত্যাগ করলো।

❑

রহমান আর বনহুর গোরী আস্তানায় বিশ্রামাগারে বসে আলাপ-আলোচনা করছিলো। বনহুর বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায় বালিশে ঠেশ দিয়ে সিগারেট পান করছিলো। মুখ খানা এখন অনেকটা প্রসন্ন, শান্ত।

রহমান তার শয্যার পাশে একটি আসনে উপবিষ্ট।

বনহুর বললো—কি নাম বললে মেয়েটির?

শিবানী। বললো রহমান।

আপন মনে উচ্চারণ করলো বনহুর—শিবানী। ব্রাহ্মণকন্যা শিবানী। রহমান, শিবানীকে তার পিতার নিকটে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছো?

পৌঁছে দেওয়া কঠিন হবে না সর্দার, কিন্তু---

কিন্তু কি? থামলে কেন বলো?

সর্দার, শিবানীকে তার পিতা গ্রহণ করলে সমাজ সেই বৃদ্ধাকে ত্যাগ করবে। শিবানীর বাবা পূজোরী ব্রাহ্মণ কাজেই সমাজ ছাড়া বাঁচার কোনো পথ নেই।

রহমানের কথা শুনে একটু হেসে বললো বনহুর—রহমান, পৃথিবীটা অর্থের দাস। শিবানীর বাবার যদি প্রচুর অর্থ থাকে তাহলে সমাজ কেন, সমাজপতিরাও তাকে পূজো করবে। অর্থের প্রাচুর্যে ঢাকা পড়বে শিবানীর সব কলঙ্ক। তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বহু অর্থ দিয়ে আসবে যেন তার অপরের কাছে হাত পাততে না হয়।

রহমান আর বনহুর যখন নির্জনে আলাপ হচ্ছিলো তখন শিবানী আড়াল থেকে সব শুনছিলো, সে স্পষ্ট দেখতেও পাচ্ছিলো বনহুর আর রহমানকে। কৃতজ্ঞতা শিবানীর মন ভরে উঠছিলো।

শিবানীর দেহে এখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ড্রেস। মুখোভাব তখনের চেয়ে অনেকটা স্বাভাবিক। চুলগুলো খোঁপা করে বাঁধা। বনহুর আর রহমানের কথাগুলো তার মনে সান্ত্বনা এনে দিয়েছে অনেক।

বনহুরের কথায় বললো রহমান—সর্দার, আপনার আদেশ পালন করবো।

করবো নয় রহমান, এখনই তুমি তৈরি হয়ে নাও।

রহমান উঠে দাঁড়ালো, বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াতেই বনহুর বললো— শোনো!

রহমান ফিরে তাকালো—বলুন সর্দার?

তোমাকে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সাজতে হবে রহমান না হলে লোকে সন্দেহ করবে। সাধু বাবাজী সেজে শিবানীকে পৌঁছে দেবে তার পিতার কাছে, বলবে দস্যুদের কবল থেকে তুমি তাকে উদ্ধার করে নিয়েছো। যাও, প্রয়োজনমত অর্থ নিয়ে যাও—দিয়ে এসো তাঁকে।

শিবানীর দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়—কে এই যুবক? নিশ্চয়ই এদের দলপতি হবে। যতই কঠিন ততই সুন্দর-কোমল ওর প্রাণ। শিবানীর মাথাটা ভক্তিভরে নত হয়ে আসে।

রহমান বেরিয়ে যায়।

শিবানীও সরে যায় আড়াল থেকে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে রহমান, তাকে দেখলে সাধু বাবাজী ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। শুভ্র দাড়ি-গোঁফ আর ভ্রু জোড়া। পরনে গেরুয়া হরিনাম বস্ত্র। গলায় যজ্ঞোপবীত ললাটে শ্বেত চন্দনের রেখা। দক্ষিণ হস্তে লৌহ চিমটা বাম হস্তে বিরাট একটি থলে।

সন্ন্যাসী বেশি রহমান কক্ষে প্রবেশ করতেই উঠে দাঁড়ালো বনহুর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে রহমানের আপদমস্তক লক্ষ্য করে বললো—নিখুঁত হয়েছে সন্ন্যাসী বাবাজী। অর্থ নিয়েছো?

হাঁ সর্দার। বললো সন্যাসী বাবাজী।

বনহুর হাতে পর পর দুটো তালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলো দু'জন অনুচর বনহুরকে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো—ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে নিয়ে এসো।

অনুচরদ্বয় বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে শিবানীসহ ফিরে এলো।

বনহুর বললো—বোন, এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তোমাকে তোমার পিতার নিকটে পৌঁছে দেবে। যাও।

শিবানী অশ্রুঁ ছলছল নয়নে তাকালো বনহুরের দীপ্ত উজ্জ্বল অপূর্ব মুখমণ্ডলের দিকে। তারপর হঠাৎ বনহুরের পায়ের কাছে বসে প্রণাম করলো।

শিবানীসহ বেরিয়ে গেলো রহমান।

অনুচরদ্বয় অনুসরণ করলো রহমান আর শিবানীকে।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো।

শিবানীর চিন্তা লাঘব হলো, এবার বনহুর গোরী দস্যুদমনে চিন্তা করতে লাগলো। কিভাবে এদের সে শায়েস্তা করবে।

বেশিক্ষণ ভাববার জন নয় দস্যু বনহুর।

উঠে পড়লো সে আসন ত্যাগ করে।

দস্যু ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নিলো, রিভলভারখানা পকেটে তুলে নিলো তারপর বেরিয়ে এলো আস্তানার বাইরে।

থমথমে রাত।

অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে আছে তাজ।

সর্দারকে আস্তানার বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখে দু'জন অনুচর মশাল হস্তে তাজের দু'পাশে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর উঠে বসলো তাজের পিঠে।

তাজের জমকালো দেহের সঙ্গে দস্যু বনহুরের জমকালো ড্রেস মিলে এক হয়ে গেলো যেন।

প্রভুকে নিয়ে উল্কাবেগে ছুটলো তাজ।

গোরী দস্যু লালারাম দলবল নিয়ে প্রস্তুত সে টের পেয়ে গিয়েছিল দস্যু বনহুর এসে গেছে গোরী পর্বতের আস্তানায়। লালারাম দস্যু বনহুর সম্বন্ধে অবগত ছিলো, জানে সে দস্যু বনহুর কতবড় ভয়ঙ্কর আর দস্যু সাংঘাতিক।

লালারাম ভাবতো সে নিজেও কম নয় এবং সেই মনোবল নিয়েই লালারাম দস্যু বনহুরের গোরী আস্তানায় হানা দিয়েছিলো।

গোরীর সর্দার বীর সিং নেশা আর নারী নিয়ে তখন মত্ত থাকায় আরও সুযোগ পেয়েছিলো লালারাম ইচ্ছামত সে হত্যা করেছিলো বনহুরের অনুচরদের আর লুট করে নিয়েছিলো অগাধ টাকাকড়ি আর সোনাদানা।

দস্যু লালারাম আর আড্ডায় দলবল নিয়ে পরামর্শ করছিলো এ আড্ডা ত্যাগ করে সরে পড়তে হবে। নইলে দস্যু বনহুর তাদের উপরে আক্রমণ চালাতে পারে।

লালারাম যখন তার অনুচরদের মধ্যে দাঁড়িয়ে চাপা কণ্ঠে বলছিলো—তোমরা আসর গুটিয়ে নাও। মালপত্র সব ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নাও। আজ রাতেই আমরা রওনা দেবো। দস্যু বনহুর গোরী পর্বতে এসে গেছে।

অনুচরদের মধ্যে একজন বলে উঠে—সর্দারজী দস্যু বনহুর এসে গেছে—এ সংবাদ কে জানালো আপনাকে?

আমাদেরই একজন গুপ্তচর। সে আরও জানিয়েছে দস্যু বনহুর তার আস্তানার সর্দার বীর সিংকে হত্যা করেছে।

সর্দারজী তাহলে তো এবার আমাদের আড্ডায় আক্রমণ চালাতে পারে?

পারে নয় মতিলাল কোন্ মুহূর্তে আক্রমণ চালিয়ে বসবে তার ঠিক নেই। কাজেই আমরা যত শীঘ্র পারি এখান থেকে সরে পড়বো।

সরে পড়ার সুযোগ তুমি আর পাবে না লালারাম। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকে ফিরে তাকালো সবাই, মুহূর্তে মরার মুখের মত রক্তশূন্য হয়ে পড়লো লালারাম ও তার দলবলের মুখ। তারা দেখতে পেল একটা অদ্ভুত জমকালো মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজার মুখে, তার দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রিভলভার।

লালারাম অস্ত্রে হাত দিতে গেলে জমকালো মূর্তি বলে উঠলো—খবরদার অস্ত্রে হাত দিও না।

লালারাম জমকালো মূর্তির দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলো কে এই অদ্ভুত মানুষ, তবু বললো—কে তুমি! কি চাও?

দস্যু বনহুর! আমি তোমার জীবন চাই।

মনে মনে শিউরে উঠলেও সাহস টেনে বললো—লালারাম—ও তুমি দস্যু বনহুর। আমার আড্ডার সন্ধান তুমি পেলে কি করে দস্যুসম্রাট?

দস্যু বনহুরের অজানা কিছুই নেই লালারাম। তোমার আড্ডার সন্ধানও আমার অজানা ছিলো না।

কি করে তুমি এই মৃত্যুকূপে প্রবেশ করলে।

অস্ত্রের ধারা পথ পরিস্কার করে।

আমার অনুচরদের তুমি হত্যা করেছো দস্যুসম্রাট?

বাধ্য হয়ে, কারণ তারা আমাকে এখানে প্রবেশে বাধা দিচ্ছিলো। বলো লালারাম কোথায় তোমার লুণ্ঠিত সম্পদ যা আমার আস্তানা থেকে নিয়ে এসেছো?

লালারাম তার অনুচরদের আদেশ করলো—দস্যু বনহুরকে আক্রমণ করো। সঙ্গে সঙ্গে লালারাম সরে দাঁড়ালো।

বনহুর গুলি ছুঁড়লো কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

ততক্ষণে লালারামের অনুচরগণ দস্যু বনহুরকে আক্রমণ করে বসলো। অস্ত্র চালালো দস্যুসম্রাটকে লক্ষ্য করে।

বনহুর এক লাফে লালারামের সম্মুখে এসে তাকে পিছন থেকে গলা চেপে ধরে গুলি চালালো লালারামের অন্যান্য অনুচরকে লক্ষ্য করে।

গুলি খেয়ে এক একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে। ধড়ফড় করে মুত্যু বরণ করতে লাগলো। লালারামকে বামহস্তের চাপে কাবু করে ফেললো বনহুর। অনুচরগণ দলপতির করুণ অবস্থা এবং সঙ্গীদের নির্মম মৃত্যু লক্ষ্য করে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। আড্ডায় পড়ে রইলো শুধু কয়েকটা মৃতদেহ আর লালারাম ও দস্যু বনহুর।

লালারাম আর দস্যু বনহুরে চললো ভীষণ লড়াই। বনহুরের হস্তে রিভলভার আর লালারামের হস্তে সূতীক্ষ্ণ ছোরা।

কেউ যেন কারো চেয়ে কম নয়।

লালারাম গোরী দেশের মানুষ, অসুরের মত শক্তি তার দেহে। যেমন হিংস্র তেমনি দুর্দান্ত। বনহুরের বুকে ছোরা বসিয়ে দেবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলো।

বনহুরের ইচ্ছা নয় লালারামকে এতো সকালে হত্যা করে। লালারামকে জীবিত বন্দী করে ওর কাছেই জেনে নেবে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তার আস্তানা থেকে লুণ্ঠিত মালপত্র। তারপর নিহত অনুচরদের জীবনের বিনিময়ে প্রতিশোধ নেবে বনহুর তিল তিল করে।

লালারাম একবার ভূতলে পড়ে গেলো , সঙ্গে সঙ্গে বনহুর রিভলভারখানা চেপে ধরলো তার বুকে।

লালারাম ছোরা ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, হাত দু'খানা তুলে ধরলো মাথার উপরে।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে লালারাম। ঠোঁটের পাশ কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জামার স্থানে স্থানে ছিঁড়ে গেছে। হিংস্র জন্তুর মত ফোঁস ফোঁস করছে সে।

বনহুর রিভলভার ঠিক রেখে বললো—লালারাম এবার বলো কোথায় আমার আস্তানা থেকে লুণ্ঠিত মালপত্র কোথায় রেখেছো?

লালারাম দাঁত পিষে বললো—বলবো না।

বলবে না?

না।

বলতে হবে তোমাকে।

লালারাম তেমনিভাবে জবাব দিলো—আমি কিছুতেই আমার গোপন ভাণ্ডারের খোঁজ তোমাকে দেবো না।

সত্যি বলছো লালারাম?

নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলো লালারাম—হাঁ সত্য বলছি। আমার জীবননাশ করতে পারো কিন্তু আমার গোপন ভাণ্ডারের সন্ধান তুমি পাবে না দস্যুসম্রাট।

লালারাম এখনি তোমার প্রাণহীন দেহটা গড়িয়ে পড়বে ধূলির মেঝেতে। ঐ গোপন ভাণ্ডারের সম্পদগুলো কোনো কাজেই আসবে না।

না এলে আমি দুঃখ পাবো না। আমার অনুচরদের মধ্যে কেউ না কেউ এ সম্পদ পাবে আর সেই হবে দস্যু লালারামের আস্তানার সর্দারজী। আমি মরতে পারি কিন্তু আমার দল মরতে পারে না, কেউ না কেউ বেঁচে থাকবে। যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে আমার নাম---

লালারামের কথাগুলো বনহুরের হৃদয় স্পর্শ করলো। সত্যি বীরের মতই কথা বলেছে লালারাম। বনহুর সত্যিকারের বীরকে কোনদিন অমর্যাদা করে না, বরং তাকে উৎসাহী করে সে অন্তর দিয়ে।

বনহুরের হস্তের রিভলভার নত হয়ে এলো, হিংস্র মুখোভাব প্রসন্ন হয়ে এলো ধীরে ধীরে, বললো—লালারাম তোমার কথা শুনে আমি প্রীত হয়েছি। তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম।

বনহুরের কথায় লালারামের চোখ দুটো নিভে এলো যেন, নিস্তেজ হয়ে এলো তার ধমনীর শিরা-উপশিরাগুলো। দস্যু বনহুর তাকে ক্ষমা করেছে।

লালারাম সদ্য মৃত্যুর মুখ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কৃতজ্ঞ হলো যেন, হঠাৎ বনহুরের পায়ে উবু হয়ে পড়তে গেলো।

বনহুর লালারামকে হাত দু'খানা দিয়ে ধরে ফেলল, তারপর বুকে টেনে নিয়ে বললো—লালারাম গোরী আস্তানার সর্দার বীর সিং এর স্থানে আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠা করলাম। আজ থেকে তুমি আমার শত্রু নও—বন্ধু।

লালারাম আনন্দে আত্মহারা হলো যেন বললো—দস্যুসম্রাট, আপনি সত্যিই মহৎ। আমরা আপনার একটি নখের সমতুল্য নই। আজ আমি ধন্য, দস্যু বনহুর আমার শত্রু নয়—বন্ধু।

বনহুর যখন দস্যু লালারাম এর নিকট হতে ফিরে এলো আস্তানায় তখন রহমান তাকে কুর্ণিশ জানিয়ে শিবানীকে পৌঁছে দেবার সংবাদ জানালো।

বনহুর সবশুনে খুশি হলো। লালারাম সম্বন্ধেও সব বললো বনহুর রহমানের কাছে।

পরদিন লালারাম বনহুরের আস্তানা থেকে লুণ্ঠিত সমস্ত মালপত্র এবং তার নিজস্ব আরও মূল্যবান সম্পদ নিয়ে হাজির হলো বনহুরের গোরী আস্তানায়। উপঢৌকনস্বরূপ সব এনে দিলো দস্যুসম্রাটের সম্মুখে।

বললো লালারাম—আজ থেকে আমি আপনার অনুগত দাস হলাম।

গোরী আস্তানায় আনন্দ উৎসব বয়ে চললো।

সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট দস্যু বনহুর।

তার দক্ষিণ পাশে রহমান আর বামপাশে উপবিষ্ট দস্যু লালারাম।

লালারামের অনুচরদের মধ্যে কয়েকজন খেলা দেখাচ্ছিলো, এমন সময় একটী সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা এসে বিদ্ধ হলো লালারামের বুকে।

আর্তনাদ করে আসন থেকে ঢলে পড়লো লালারাম ভূতলে।

অকস্মাৎ আনন্দ উৎসব স্তব্ধ হয়ে গেলো।

বনহুর আর রহমান ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়ালো। চোখ দুটো জ্বলে উঠলো বনহুরের। কঠিন কণ্ঠে বললো—কার এমন দুঃসাহস আমার আস্তানায় প্রবেশ করে লালারামকে হত্যা করলো? যাও দেখো---

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের অনুচরগণ দরবারকক্ষ ত্যাগ করে অশ্ব নিয়ে ছুটলো; কিন্তু কেউ তাকে খুঁজে পেলো না কে লালারামকে হত্যা করেছে।

ফিরে এলো অনুচরগণ বিফল হয়ে।

বনহুর ততক্ষণে লালারামের বুক থেকে ছোরাখানা তুলে নিয়েছে। বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—রহমান, যাও এই মুহূর্তে যে কোনো ডাক্তারকে নিয়ে এসো, লালারামের বুকে ছোরাখানা বিদ্ধ হলেও তার ফুসফুসে বা হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হয়নি। যেমন করে হউক একে বাঁচাতেই হবে।

রহমান কালবিলম্ব না করে ছুটলো ডাক্তারের সন্ধানে।

লালারাম ছোরার আঘাতে মৃত্যুবরণ না করলেও সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়লো। অত্যন্ত রক্তক্ষয়ে লালারাম ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ হয়ে আসছে।

ওদিকে রহমান এক ডাক্তারের চেম্বারের সম্মুখে দাঁড়ালো। ডাক্তার সবেমাত্র কলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলো। রহমান দেখলো গাড়ির মধ্যে ড্রাইভার বসে বসে ঝিমুচ্ছে। রহমান একটু ভেবে নিলো, তারপর অদূরে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো—বাঁচাও ভাই বাঁচাও--এমনভাবে শব্দটা করলো, যাতে শব্দটা বেশি দূরে না গিয়ে শুধু ড্রাইভারের কানে যায়।

ড্রাইভার চমকে উঠলো তাইতো। কে বাগানে?—গাড়ি থেকে নেমে ছুটলো বাগানের মধ্যে।

রহমান একটা পাইন ঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে ছিলো।

ড্রাইভার এদিক-সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগুচ্ছে, কোথা থেকে শব্দটা এসেছিলো। যেমন সে পাইন ঝাড়ের পাশে এসে পড়েছে অমনি রহমান তাকে পিছনে থেকে জাপটে ধরে ফেললো গলায় চাপ দিতেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো ড্রাইভার।

রহমান দ্রুতহস্তে ড্রাইভারের পোশাক খুলে পরে নিলো তারপর ড্রাইভারকে পাইন ঝাড়ের নিচে শুইয়ে রেখে গাড়ির ড্রাইভ আসনে এসে বসলো।

ঠিক সেই সময় ডাক্তারবাবু এসে বসলেন পিছন আসনে। একটি বয় ডাক্তারী ব্যাগটা এনে গাড়িতে রেখে গেলো।

গাড়ি ছুটলো উল্কাবেগে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর গাড়িখানা নির্জন পাহাড়িয়া পথে এসে পড়লো।

ডাক্তার বললেন—ড্রাইভার এ তুমি কোন পথে চলেছো?

রহমান এতোক্ষণ দক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি চালিয়ে চলেছিলো। হঠাৎ ফিরে তাকায় সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার উঁচিয়ে ধরে ডাক্তারের দিকে—খবরদার কোনোরকম আপত্তি করবেন না, আমার সঙ্গে যেতে হবে আপনাকে।

ডাক্তার বিস্মিত হতভম্ব—ড্রাইভারের আসনে এটা কে? কি উদ্দেশ্য এর? ফ্যাকাশে মুখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন ডাক্তার।

রহমান বললো—আপনি দয়া করে সরে আসুন কারণ আপনার চোখে রুমাল বাঁধতে হবে।

ডাক্তার আপত্তি করার সাহস পেলো না, কারণ রহমানের চেহারা বলিষ্ঠ কঠিন মুখমণ্ডল আর তার হস্তের আগ্নেয় অস্ত্রটা ডাক্তারকে ভীত করে তুলেছিলো। বাধ্য হলেন তিনি রহমানের দিকে মাথাটা এগিয়ে দিতে।

রহমান একখানা কালো রুমাল বের করে ডাক্তারের চোখ দুটো বেঁধে ফেললো, তারপর বললো—ডাক্তারবাবু ভয়ের কোনো কারণ নেই, আবার আপনাকে পৌঁছে দেবো আর পাবেন প্রচুর অর্থ।

ডাক্তার নীরবে বসে রইলেন।

রহমান গাড়ি চালিয়ে গোরী পর্বত অভিমুখে চললো।

পাথুরে পথে অতি সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিলো রহমান। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হবার পর পথ অতি দুর্গম হওয়ায় গাড়ি রেখে নেমে পড়লো রহমান, ডাক্তারকেও নামিয়ে নিলো সে গাড়ি থেকে।

রহমানের এক হস্তে ডাক্তারের হস্ত বিপরীত হস্তে ঔষধের ব্যাগ নিয়ে গৌরী পর্বতের শৃঙ্গ অতিক্রম করে চললো। বারবার পড়তে পড়তে বেঁচে যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু।

রহমান তাকে সামলে নিচ্ছিলো সাবধানে।

একসময় পৌঁছে গেলো রহমান ডাক্তারসহ গৌরী আস্তানায়।

বনহুর দলবল নিয়ে তখন লালারামকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। রহমান ডাক্তারসহ পৌঁছতেই খুশি হলো বনহুর।

নিজ হস্তে বনহুর খুলে দিলো ডাক্তারের চোখে বাঁধা কালো রুমালখানা।

ডাক্তারের চোখে ঝরে পড়লো রাজ্যের বিস্ময়। তিনি বনহুরকে দেখে প্রথমে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, ভাবলেন কে এই যুবক! বনহুরের সৌন্দর্য তাকে কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি করে ফেললো। তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারলেন, যে স্থানে এখন তিনি এসেছেন সে স্থান স্বাভাবিক নয়, নিশ্চয়ই কোনো দস্যু বা ডাকাতের আস্তানা।

বনহুরকে লক্ষ্য করে এটাও ডাক্তার বাবু বুঝতে পারলেন—এই যুবকই দলপতি। তাই ডাক্তারবাবু তাকেই প্রশ্ন করলেন—আমাকে এখানে কেন আনা হলো বলো?

বনহুর বললো—রোগী দেখার জন্য। আসুন ডাক্তার বাবু ---বনহুর ডাক্তারসহ গুহার ভিতরে প্রবেশ করলো।

একটা শয্যায় মৃত পড়ে আছে লালারাম। তার চারপাশে দণ্ডায়মান অন্যান্য অনুচর। বনহুর ডাক্তারবাবুকে লক্ষ্য করে বললো—একে দেখুন ডাক্তার বাবু বাঁচানো যায় কিনা। যত অর্থ আপনি চান তাই দেবো।

ডাক্তার কিছুক্ষণ লালারামের সংজ্ঞাহীন বলিষ্ঠ সবল কঠিন দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এক পাশে একটা মশাল দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। মশালের আলোতে ডাক্তার সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। এখন তাঁর চিন্তাধারা স্থির হয়েছে, বুঝতে পেরেছেন তিনি—এরা ডাকু। এখন এদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া একমাত্র উপায় হলো রোগীকে চিকিৎসা করে ভালো করা।

ঔষধের ব্যাগ খুলে রোগীর পাশে গিয়ে বসলেন ডাক্তার। ভয়-বিহ্বল কম্পিত হস্তে তুলে নিলেন লালারামের বলিষ্ঠ হাত খানা নিজের হাতে। পালস্ পরীক্ষা করতে লাগলো ডাক্তার।

বনহুর বুঝতে পারলো ডাক্তার ভয় পাচ্ছেন। সে আশ্বাস দিয়ে বললো—ডাক্তারবাবু আপনি ভীত হবেন না। নির্ভয়ে আপনি ওর চিকিৎসা করুন।

ডাক্তার সব পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর মনোযোগ সহকারে চিকিৎসা শুরু করলেন।

বনহুর বললো—ডাক্তারবাবু রোগীর জ্ঞান ফিরে না আসা অবধি আপনাকে আমরা এখানে আটকে রাখবো। রোগী সুস্থ হলে আপনাকে পৌঁছে দেবো আপনার বাড়িতে।

প্রতিবাদ করে কোনো উপায় নেই জেনে ডাক্তার রাজি হলেন অগত্যা। চিকিৎসা চললো লালারামের।

কয়েকদিনের মধ্যে লালারাম সুস্থ হয়ে উঠলো। ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টায় ওকে বাঁচিয়ে তুললেন। প্রায় এক সপ্তাহ পর লালারাম যেদিন শয্যায় উঠে বসলো সেদিন দস্যু বনহুরের আনন্দ আর ধরে না।

ডাক্তাববাবুকে প্রচুর অর্থ দিলো বনহুর তারপর রহমানকে বললো—যাও রহমান, ডাক্তারবাবুকে তাঁর আবাসে পৌঁছে দিয়ে এসো।

রহমান বললো—আচ্ছা সর্দার।

তারপর ডাক্তারসহ রহমান ফিরে এলো গোরী পর্বতের সেই নির্জন স্থানে যেখানে ছিলো ডাক্তারের গাড়িখানা।

রহমান গাড়ির নিকটে পৌঁছে ডাক্তারের চোখের রুমাল খুলে দিলো, বললো—চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ডাক্তার বিনাবাক্যে গাড়িতে উঠে বসলেন।

রহমান বসলো ড্রাইভ আসনে।

গাড়ি ছুটলো পর্বতের গা বেয়ে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই হঠাৎ পর্বতের আড়াল থেকেই একটি গুলি এসে বিদ্ধ হলো গাড়ির টায়ারে। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বেরিয়ে গেলো চাকা থেকে।

থেমে পড়লো গাড়িখানা।

রহমান সম্মুখে তাকাতেই দেখতে পেলো, অদূরে গোরী পর্বতের পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে আছে একটি অদ্ভুত নীলাভো পোশাক-পরা নারীমূর্তি। মূর্তিটি যে নারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ তার দেহের

পোশাকেই বেশ বুঝা যাচ্ছে। যদিও প্যান্ট পরা গায়ে জামা পায়ে বুট কোমরে বেল্ট-রিভলভারের খাপ মাথায় পাগড়ী, পাগড়ীর কিছুটা অংশ দিয়ে মুখের নিচের অংশটা ঢাকা রয়েছে। দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রিভলভার। রিভলভারের গুলিই যে তাদের গাড়ির চাকায় বিদ্ধ হয়েছে বুঝতে পারে রহমান।

গাড়িখানা থেমে পড়তেই ডাক্তার নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ করে উঠলেন—রাণী দুর্গেশ্বরী কিন্তু ডাক্তারের কণ্ঠ থেমে গেলো মুহূর্তে।

একখানা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো ডাক্তারের পাঁজরে।

তীব্র আর্তনাদ করে ডাক্তার মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো গাড়ির মেঝেতে।

রহমান ফিরে তাকিয়ে দেখলো, নারীমূর্তি রিভলভার বাম হস্তে ধরে দক্ষিণ হস্তে ছোরাখানা নিক্ষেপ করেছিলো। রহমান ফিরে তাকাতেই দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলো পর্বতের আড়ালে।

রহমান শুনতে পেলো ঘোড়ার খুরের শব্দ।

রহমান দেখলো, ডাক্তার বাবুর প্রাণবায়ু বিলীন হয়ে গেছে অসীম আকাশে। হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করছে কিন্তু দুঃখ করার সময় এখন কই! রহমান এবার গাড়ি থেকে নেমে ছুটলো যেখানে একটু পূর্বে সেই অদ্ভুত নারীমূর্তিটিকে দেখেছিলো সে।

কিন্তু সেই স্থানে পৌঁছে দেখলো কিছুই নেই—চারদিকে শূন্য, বাতাস বইছে সাঁ সাঁ করে। বাতাসে শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ একটা শব্দ খট্ খট্ খট্--

নতুনমুখে এসে দাঁড়ালো রহমান, মুখভাব গম্ভীর থমথমে। দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণ একখানা ছোরা।

বনহুর তখন গোরী আস্তানায় দরবারকক্ষে বসে ছিলো তার পাশে বসে লালারাম সর্দার। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিলো। লালারাম এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়।

রহমান এসে দাঁড়াতেই চমকে উঠলো দরবারকক্ষের সবাই। বনহুরও চমকে উঠলো কারণ রহমানের মুখোভাব অত্যন্ত ভাব গম্ভীর ছিলো। তাছাড়াও তার হাতে এখানা রক্তমাখা ছোরা।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—কি ব্যাপার রহমান?

সর্দার, ডাক্তারবাবু নিহত হয়েছে। কোন ভূমিকা না করেই বললো রহমান।

বনহুর যেন আর্তনাদ করে উঠলো—কি বললে রহমান ডাক্তার নিহত হয়েছে?

হাঁ সর্দার। এই দেখুন---ডাক্তারের বুক থেকে তুলে নেওয়া ছোরাখানা রহমান বনহুরের সম্মুখে তুলে ধরলো —এ ছোরা দিয়েই ডাক্তারকে হত্যা করা হয়েছে।

বনহুর ছোরাখানায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চমকে উঠলো। ছোরাখানা হাতে নিয়ে বললো—এ যে দেখছি ঐ ছোরা যে ছোরা দ্বারা লালারামকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিলো। তখনই বনহুর আদেশ দিলো—লালারামকে যে ছোরা দ্বারা হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিলো সে ছোরাখানা কোথায় নিয়ে এসো।

অল্পক্ষণেই সেই ছোরাখানা আনা হলো।

বনহুর ছোরা দু'খানা একই স্থানে রেখে পরীক্ষা করে বললো—আশ্চর্য এ ছোরা দু'খানা একই রকম দেখছি।

রহমান বললো—সর্দার, ছোরা নিক্ষেপকারী পুরুষ নয়—নারী।

বনহুর অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—নারী?

হাঁ সর্দার। রহমান সমস্ত ঘটনা বলে গেলো বনহুরের কাছে।

সব শুনে বনহুর শুধু অবাকই হলো না তার মনে আর একটি দোলা জাগলো—কে এই অদ্ভুত নারীমূর্তি? যে শুধু লালারামকেই হত্যা করতে চেষ্টা করেনি, ডাক্তারটিকে হত্যা করলো। ছোরা দু'খানা যে একই হস্তে নিক্ষিপ্ত তাতে কোনো রকম ভুল নেই।

বনহুর পুনরায় ছোরা দু'খানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো। ছোরা দু'খানার বাটে অদ্ভুত সিংহী মূর্তি আঁকা রয়েছে। ছোরার বাটগুলো স্বর্ণতৈরি। কোনো নিপুণ কারিগর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে ছোরাগুলো।

বনহুর যখন ছোরা দু'খানা হাতে নিয়ে ভাবছে তখন লালারাম বলে উঠলো—দস্যুসম্রাট আপনি ছোরা দু'খানা দর্শন করে বিস্মিত হয়েছেন বুঝতে পেরেছে। ছোরা দু'খানার নিক্ষেপকারী নারী এবং সিংহীর মত হিংস্র আর ভয়ঙ্কর সে।

রহমান বললো—সর্দার ডাক্তার সেই অদ্ভুত নারীমূর্তি লক্ষ্য করে ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বলেছিলো-রাণী দুর্গেশ্বরী---

লালারাম ঢোক গিলে বললো—হাঁ, সর্দার ঐ ছোরা দু'খানা রাণী দুর্গেশ্বরী দেবীর— লালারামের কণ্ঠ কেঁপে উঠলো থর থর করে।

বনহুর তাকালো লালারামের মুখে ছাই এর মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল। চোখ দুটো ভয়কাতর ম্লান মনে হলো।

বনহুর বুঝতে পারলো রাণী, দুর্গেশ্বরী দেবী সাধারণ নারী নয়। লালারামের মত জনও তাকে যমের মত ভয় করে। দুর্গেশ্বরী তাকে হত্যা করেছিলো আর কি। হত্যা করলো অসহায় ডাক্তারটিকে। কতবড় সাংঘাতিক আর ভয়ঙ্কর এই নারী বুঝতে বাকি রইলো না দস্যু বনহুরের।

বনহুরের ভ্রু দু'টি কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, দুর্গেশ্বরী দেবী তাহলে বনহুরের গোরী আস্তানার সন্ধানও জানে। একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো তার মুখমণ্ডলে—কে এই নারীমূর্তি?

লালারাম বনহুরের মনোভাব বুঝতে পারলো যেন বললো সে—সর্দার একটি কথা আপনাকে বলা হয়নি এখনও।

বলো কি বলতে চাও?

রাণী দুর্গেশ্বরীর কবল থেকে আমার রক্ষা নেই। তার হাতেই আমাকে জীবন দিতে হবে সর্দার---

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে তাকালো লালারামের মুখের দিকে।

লালারামের চোখ দুটো কেমন নিষ্প্রভম্লান হয়ে এসেছে যেন ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বললো আবার—রাণী দুর্গেশ্বরীর দলেই একদিন আমি ছিলাম, কোনো এক কারণে আমি তার দল থেকে চলে আসি। থামলো লালারাম। হয়ত বা ভয় হচ্ছিলো, কখন কোন্ দিক থেকে দুর্গেশ্বরীর নিক্ষিপ্ত ছোরা এসে বিদ্ধ হয় তার বুকে।

বনহুর বললো—লালারাম রাণী দুর্গেশ্বরী কে তাই আমি জানতে চাই?

এখানে নয়, চলুন সর্দার আপার বিশ্রামকক্ষে। রাণী দুর্গেশ্বরী আমাকে বলবার সুযোগ নাও দিতে পারে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো—চলো, তাই চলো—আমার বিশ্রাম কক্ষেই চলো লালারাম।

লালারাম মাঝখানে তার দক্ষিণ পাশে বনহুর, বাম পাশে রহমান এগিয়ে চললো গোরী আস্তানার গোপন কক্ষে।

লালারাম এখন সম্পূর্ণ সুস্থ নয় সে বুকে হাত রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলো। হয়তো বা হাঁটতে তার কষ্ট বোধ হচ্ছিলো তাই সে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছে।

বনহুর বললো—লালারাম তোমার চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

না সর্দার, খুব কষ্ট হচ্ছে না।

পারবে এতটা পথ চলতে?

না পারলেও আমাকে পারতে হবে সর্দার। কারণ আমার মৃত্যু নিশ্চিত---থামলো লালারাম হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলো—আমাকে আরোগ্য করার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন ডাক্তারবাবু। ডাক্তার সম্পূর্ণ নির্দোষ—তাকেও দুর্গেশ্বরী ক্ষমা করলো না। আর আমাকে সে জীবিত রাখবে এ কখনই হতে পারে না। মরতে যখন হবেই তখন সব বলেই মরবো সর্দার---

বনহুর আর রহমান দু'দজন একসঙ্গে তাকালো যন্ত্রচালিত পুতুলের মত লালারামের মুখের দিকে।

লালারাম রীতিমত হাঁপাচ্ছে অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হচ্ছিলো তাকে।

বনহুর সান্ত্বনাভরা কণ্ঠে বললো—মিছে মিছে তুমি বেশি চিন্তিত হচ্ছো লালারাম। আমি তোমাকে আমার কান্দাই আস্তানায় নিয়ে যাবো। সেখানে কারো সাধ্য নেই তোমাকে হত্যা করে।

সর্দার, সে সুযোগ আসবে কিনা কে জানে। আমি জানি দুর্গেশ্বরী আমাকে হত্যা করবেই—একটু পা চালিয়ে চলুন—সব বলবো আমি, সব বলবো।

লালারাম যতদূর সম্ভব জোরে চলতে লাগলো। বনহুর নিজে লালারামের চলায় সাহায্য করার জন্য দক্ষিণ হস্তখানা দিয়ে ধরে ফেললো তাকে।

সেই মুহূর্তে আচম্বিতে একখানা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো লালারামের বুকের ঠিক মাঝখানে। তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো লালারাম—সর্দার ---কিন্তু আর কোনো শব্দ সে উচ্চারণ করতে পারলো না। কারণ তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চলে গিয়েছিলো ছোরাখানা।

বনহুর আর রহমান লালারামের দেহটাকে শক্ত করে ধরে ফেললো।

বিস্ময়ভরা নজরে বনহুর আর রহমান তাকালো সম্মুখে, কিনতু কিছুই নজরে পড়লো না। কোথা থেকে ছোরাখানা এসেছিলো তাও বুঝতে পারলোনা তারা।

লালারামের দেহটাকে ভূতলে শুইয়ে দিয়ে মাথাটা তুলে নিলো বনহুর নিজের কোলের উপর, ছোরাখানা তুলে নিল একটানে ওর বুক থেকে। অমনি ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো, ছড়িয়ে পড়লো বনহুরের চোখেমুখে।

রহমানও হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলো লালারামের পাশে, অধর দংশন করলো রহমান ব্যথা বেদনায় মুখখানা তার কালো হয়ে উঠলো।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো—লালারাম শুনে যাও—রাণী দুর্গেশ্বরী যেই হউক তাকে দস্যু বনহুর ক্ষমা করবে না---

সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে এলো নারীকণ্ঠের অদ্ভুত হাস্যধ্বনি, খিল খিল করে কেউ যেন কোথাও হেসে উঠলো।

বনহুর লালারামের মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো ছুটে বেরিয়ে গেলো বাইরে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না সে, শুধু তার কানেএলো অশ্বপদ শব্দ—খট্ খট্ খট্ —দূরে---- অনেক দূরে কেউ যেন ঘোড়া নিয়ে চলে যাচ্ছে।

পরবর্তী বই

দস্যু বনহুর ও রাণী দুর্গেশ্বরী

দস্যু বনহুর ও রাণী দুর্গেশ্বরী—৪০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

খট্ খট্ খট্ শব্দ মিশে যাওয়ার পূর্বেই বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসলো।

সঙ্গে সঙ্গে তাজ পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে সম্মুখের দু'পা উঁচু করে অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো— চিঁ হিঁ চিঁ হিঁ---তারপর উল্কা বেগে ছুটতে শুরু করলো। গোরী পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় তাজের খুড়ের প্রতিধ্বনি জাগলো। নিস্তব্ধ আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠলো সে শব্দে।

একপাশে আকাশচুম্বী সুউচ্চ পর্বতমালা আর একপাশে গভীর খাদ। কোনোক্রমে একবার তাজের পদস্ফলন ঘটলে আর রক্ষা নেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মৃত্যু অবধারিত।

কোনো দিকে খেয়াল নেই বনহুরের উল্কা বেগে ছুটে চলেছে সে তাজের পিঠে। কে সে নারীমূর্তি যে রাক্ষসীর চেয়েও ভয়ঙ্কর, সাংঘাতিক। যে বিনা দ্বিধায় দস্যু বনহুরের আস্তানায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। যে নির্মমভাবে হত্যা করলো লালারামকে হত্যা করলো নিরীহ ডাক্তারটাকে। কে সেই পিশাচিনী রাণী দুর্গেশ্বরী। যার হাসির শব্দ শুধু অদ্ভুত বিস্ময়কর নয় যাদুমন্ত্রের মত তীব্র। কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবে না সে ক্ষমা করতে পারবে না। দস্যু বনহুর প্রতিশোধ নেবে লালারাম ও ডাক্তার হত্যার আর তার আস্তানায় প্রবেশের অপরাধের।

বনহুরের কানে ভেসে আসছে তখনও সেই শব্দ খট্ খট্ খট্--দূরে অনেক দূরে সরে গেছে শব্দটা।

বনহুর সেই ক্ষীণ শব্দ লক্ষ্য করেই অশ্ব চালনা করে চলেছে।

অভিজ্ঞ অশ্বতাজ—প্রভুর মনোভাব সে বেশ বুঝতে পারে। এই মুহূর্তে সে বুঝে নিয়েছে কি তার কর্তব্য। ঐ ক্ষীণ শব্দটাই যে প্রভুর লক্ষ্য তা সে জানে তাই সে প্রাণপণে ছুটছে।

পর্বতের গা বেয়ে পথটা ক্রমান্বয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। কোনো স্থানে গভীর ঢালু কোনো স্থানে দু'পাশে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। আবার কোনো স্থানে পর্বতের গা বেয়ে নেমে এসেছে খরস্রোতা ঝর্ণাধারা।

তাজ ঝর্ণার পানির মধ্য দিয়েই ছুটলো।

যেখানে গভীর খাদ সেখানে লাফ দিয়ে পার হচ্ছে। দূরে, বহু দূরে চলে এসেছে বনহুর তাজসহ। আশ্চর্য হলো বনহুর গোরী পর্বতের এ অঞ্চলের মনোরম দৃশ্য দেখে। অশ্ব খুরের ক্ষীণ শব্দটা এখন সম্পূর্ণ মিশে গেছে।

বনহুর তাজের লাগাম টেনে ধরলো।

গোরী পর্বতের এ স্থানটা বেশ প্রশস্ত, মাঝে মাঝে পাথর খণ্ডের বুক চিরে বয়ে চলেছে নদী আর নালা। স্থানে স্থানে সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত নদীর ধারগুলো।

বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো, আর এগুবে কিনা ভাবছে সে। সম্মুখে কলকল করে বয়ে চলেছে একটি সরু নদী। নদীর জলধারা ছোট ছোট পাথরখণ্ডের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে নিচের দিকে।

বনহুর অত্যন্ত পিপাসা বোধ করায় পানির ধারে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো। তারপর দু'হাতের অঞ্জলি ভরে তুলে নিলো স্বচ্ছ পানি। যেমন সে মুখে ধরবে ঠিক সেই সময় একখানা ছোরা এসে গেঁথে গেলো তার পাশে মাটির মধ্যে।

পানি পান করা আর হলো না বনহুরের। চমকে ফিরে তাকাতেই তার আংগুলের ফাঁকে অঞ্জলির পানিগুলো ঝরে পড়ে গেলো। তাড়াতাড়ি ছোরাখানা তুলে নিলো হাতে। এ যে সেই ছোরা, ছোরার বাটে স্বর্ণ তৈরি সিংহী মূর্তি।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো নিশ্চয়ই আশে পাশে দূরে কোথাও আত্মগোপন করে আছে সেই পিশাচিনী। বনহুরের ধমনীর রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো মুহূর্তে তাজের পাশে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ ভেসে এলো সেই হাসির শব্দ নারীকণ্ঠের খিল খিল আওয়াজ।

বনহুর শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেলো , দক্ষিণ হস্তে গুলিভরা উদ্যত রিভলভার। চোখ দুটি দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে।

বনহুর অনেক সন্ধান করেও কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো তার। চারদিকে শুধু পাথর আর খরস্রোতা জলধারা ছাড়া কিছুই নজরে পড়লো না।

তাজের লাগাম ধরে এগুলো বনহুর সম্মুখে, এদিক-সেদিক আরও কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করার পর আবার ফিরে এলো গোরী আস্তানায়।

বনহুর ফিরে আসতেই রহমান তাকে অভ্যর্থনা জানায়।

অন্যান্য অনুচর তাজকে নিয়ে চলে যায়।

বনহুর আর রহমান এগিয়ে চলে আস্তানার মধ্যে বিশ্রাম কক্ষের দিকে।

সর্দারের মুখোভাব লক্ষ্য করে রহমান বুঝতে পারে নিশ্চয়ই কার্যসিদ্ধ হয়নি। সহসা কিছু জিজ্ঞেস করার সাহসও হয় না তার। বনহুরকে নীরবে অনুসরণ করলো সে।

বনহুর বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে মাথার পাগড়ীটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বিছানার উপরে। হাতের রিভলভারখানা সশব্দে টেবিলে নিক্ষেপ করলো।

রহমান নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর ক্ষিপ্রভাবে কিছুক্ষণ পায়চারী করলো তারপর গম্ভীর কণ্ঠে অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ।

বিস্মিত হলো রহমান, সর্দারকে এভাবে হঠাৎ হাসতে দেখে মনে মনে শিউরে উঠলো সে। না জানি কি ঘটনার সংযোগ ঘটেছে তার জীবনে, যার জন্য সর্দার এত বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

সহসা আপন মনেই বলে উঠলো বনহুর—রাণী দুর্গেশ্বরী--হাঃ হাঃ হাঃ, রাণী দুর্গেশ্বরী---দস্যু বনহুরের চোখে ধুলো দেবে সে! রহমান।

বলুন সর্দার?

লালারামের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করেছো?

হ্যাঁ সর্দার! লালারামের মৃতদেহ দাহ করার জন্য শ্মশান ঘাটে পাঠানো হয়েছে।

শ্মশানঘাটে কেন?

লালারাম হিন্দু, কাজেই তার মৃতদেহ হিন্দুমতেই সৎকার করা হয়েছে সর্দার।

বেশ ভালই করেছো। বনহুর আসন গ্রহণ করলো।

রহমান বললো—সর্দার, রাণী দুর্গেশ্বরীর কোন সন্ধান পাননি?

পাইনি, সত্যি বিস্ময়কর এ নারী। আবার অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো বনহুর। সে হাসির শব্দে গোরী পর্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জাগলো।

❑

গোরী পর্বতের দুর্গম গহ্বরে রাণী দুর্গেশ্বরীর আস্তানা। আস্তানার চারপাশে গোরী পর্বতের সুউচ্চ পাষাণ প্রাচীর। সে স্থানে দুর্গেশ্বরীর অনুচর ছাড়া একটি পিপীলিকা প্রবেশেরও সাধ্য নেই।

রাণী দুর্গেশ্বরী জানে,এই গোরী রাজ্যের একমাত্র রাণী সে। শুধু রাণীই নয় নিজকে সে নারীরত্ন বলে মনে করে। কারণ দুর্গেশ্বরী শুধু শক্তিশালিনী নারী নয় সে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা রমণী।

কিন্তু কে এই দুর্গেশ্বরী? কি এর পরিচয়?

গোরী রাজ্য আজ প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে এই দস্যুরাণীর অত্যাচারে। প্রতিদিন গোরী রাজ্যের দু'চার জন নাগরিকে যে নিরুদ্দেশ হচ্ছে না তা নয়। এসব নিরীহ জনগণ কোথায় যায় কি হয়—কেউ জানে না। শুধু এটুকুই সবাই জানে, যারা নিখোঁজ হয়েছে তারা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। কারণ যারা একবার হারিয়ে গেছে তারা আর আসেনি।

শুধু নাগরিকদের হরণ করেই ক্ষান্ত হয় না দুর্গেশ্বরী। লুট তরাজ লেগেই আছে। গভীর রাতে অসংখ্য অনুচরসহ গোরী রাজ্যে প্রবেশ করে এবং নাগরিকদের সব কিছু হরণ করে নিয়ে যায়। ঐশ্বর্য আর সম্পদের সঙ্গে বাড়ির দু'চার জনকেও বেঁধে নিয়ে যায় তারা।

গোরী রাজ্যের এই চরম মুহূর্তে নিশ্চুপ থাকতে পারলেন না গোরীরাজ বাসুদেব। তিনি গোরীর পুলিশ মহলকে সজাগ হবার জন্য নির্দেশ দিলো।

পুলিশ মহল সজাগ হয়েও কোন ফল হলো না। রাণী দুর্গেশ্বরী ঠিক তার পূর্বকার্য পদ্ধতি মতই কাজ হাসিল করে চললো।

গোরীর রাজা বাসুদেব বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লো। কি করা যায় কি করে রাণী দুর্গেশ্বরীকে দমন করা যায়। রাজ্যের সৈন্য-সামন্ত এবং পুলিশ ফোর্স বহু সন্ধান করেও এই দুর্দান্ত মহিলার কোন খোঁজই পেলো না।

রাজা বাসুদেব যখন রাণী দুর্গেশ্বরীকে নিয়ে ভীষণ অশান্তি আর দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন তখন হরিনাথের রাজপুত্র স্বপন কুমার এসে জানালো—মহারাজ, আমি রাণী দুর্গেশ্বরীকে পাকড়াও করবো।

বাসুদেব স্বপন কুমারের কথায় অত্যন্ত প্রীত হলেন, তিনি নিজের আসনের পাশে বসিয়ে বললেন—তোমার কথায় শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হলাম। রাণী দুর্গেশ্বরীর অত্যাচারে গোরী রাজ্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এ সময় তোমার মত একজন সাহসী যুবককে পেয়ে আমি অনেক খুশি হলাম। স্বপন, তোমার পিতা আমার বাল্যবন্ধু কাজেই তুমি আমার সন্তান সমতুল্য।

মহারাজ বাসুদেব পত্নী রাণী মঙ্গলা দেবী স্বপনকুমারকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন, যদিও রাণী মঙ্গলা দেবীর বয়স স্বপনকুমারের চেয়ে

কমই হবে তবু তার মধ্যে ছিলো মাতৃ সুলভ একটি মায়াময়ী প্রাণ। অত্যন্ত মহৎ হৃদয়সম্পন্ন মহিলা ছিলো তিনি।

বৃদ্ধা বাসুদেবের দ্বিতীয় পক্ষ স্ত্রী মঙ্গলা দেবী।

প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর মহারাজ বাসুদেব যখন শোকে কাতর হয়ে পড়েছিলো, একমাত্র সন্তান যুবরাজ মহাদেবকে নিয়ে তিনি যেন কোনস্বস্তি পাচ্ছিলেন না তখন বৃদ্ধ মন্ত্রীকন্যা মঙ্গলা দেবী স্বইচ্ছায় বৃদ্ধা মহারাজ বাসুদেবের গলায় মালা দিয়ে ছিলো এবং নিজ হস্তে যুবরাজ মহাদেবের লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলো।

মঙ্গলা দেবী হরিনাথের রাজপুত্র স্বপনকুমারকে পুত্র সমতুল্য স্নেহে গ্রহণ করলেন।

রাজ অন্তঃপুরে স্থান পেল স্বপনকুমার।

স্বপনকুমার হরিনাথ রাজ্যের মহারাজ গণেশের একমাত্র সন্তান। গোরী রাজ্যের এই চরম দুর্দিনে মহারাজ গণেশ বন্ধুবর বাসুদেবের সাহায্য এগিয়ে আসবেন ভাবছেন এমন সময় স্বপন কুমার জানালো— বাবা আপনি বৃদ্ধ, কাজেই আপনি ক্ষান্ত, হউন, আমি যাচ্ছি কাকা বাসুদেবকে সাহায্যে করতে।

পুত্রের কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন মহারাজ গণেশ তিনি আনন্দিত মনে পাঠালেন স্বপন কুমারকে গোরী রাজ্যে।

স্বপন কুমার ছিলো শিশুকাল থেকেই দুঃসাহসী আর দুর্দান্ত। গোরী রাজ্যে যখন রাণী দুর্গেশ্বরী তোলপাড় শুরু করেছে তখন সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারলো না। মনে অদম্য উৎসাহ নিয়ে ছুটে এলো দস্যুরাণী দুর্গেশ্বরীকে গ্রেফতার আশায়।

আশা তার সফল হবে কিনা সন্দেহ।

রাণী দুর্গেশ্বরীর অজ্ঞাত কিছু ছিলো না, গোরী রাজ্যের সব ছিলো তার নখদর্পনে।

আজ দুর্গেশ্বরী তার আসনে উপবিষ্টা অনুচরগণকে লক্ষ্য করে কঠিন কণ্ঠে বললো—তোমরা জানো না, আমাকে গ্রেফতারের জন্য শুধু পুলিশ মহলই নয় মহারাজা বাসুদেবের বন্ধু সুসন্তান স্বপন কুমার সেনও ছুটে এসেছে হরিনাথ রাজ্য থেকে গোরী রাজ্যে।

দুর্গেশ্বরীর প্রধান অনুচর রক্তচক্ষু ধারণ করে গর্জে উঠলো— স্বপন কুমারের সাধ্য কি রাণীজীকে পাকড়াও করে।

দুর্গেশ্বরী দাঁতে দাঁত পিষে বললো—স্বপন কুমারকে আমি গ্রাহ্য করি না বাহরাম। ওকে আমি তুচ্ছ মনে করি। আমি চাই দস্যু বনহুরকে সায়েস্তা করতে। কারণ সে আমার পিছু নিয়েছে।

রাণীজী হুকুম করুন, আমরা তাকে হত্যা করে তার মাথাটা কেটে নিয়ে আসি?

না, তাকে হত্যা করা চলবে না।

তা হলে কি করবো রাণীজী?

তাকে বন্দী করে নিয়ে এসো।

দুর্গেশ্বরীর প্রধান অনুচর বাহরাম ক্ষণিকের জন্য চিন্তিত হলো সে কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নত করলো।

দুর্গেশ্বরী গর্জে উঠলো—দস্যু বনহুরকে বন্দী করে আনার মত সাহস তোমার নেই বাহরাম?

বাহরাম মুখ তুললো—রাণীজী দস্যু বনহুর---থেমে ছিলো বাহরাম।

দুর্গেশ্বরীর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে, বললো—বলো, থামলে কেন?

রাণীজী দস্যু বনহুর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তাকে গ্রেফতার করে ধরে আনা কম কথা নয়।

বুট দিয়ে মাটিতে আঘাত করে দুর্গেশ্বরী—অপদার্থ তোমরা পারবে কেন। লালরাম শেষ পর্যন্ত দস্যু বনহুর হস্তে আত্মসমর্পণ করে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিল---হাঃ হাঃ হাঃ আমি তাকে জন্মের মত পরিত্রাণ দিয়েছি। দাঁতে দাঁত পিষলো দস্যুরাণী।

ঐ মুহূর্তে দুর্গেশ্বরীর পদতল আসনে এসে বিদ্ধ হলো একটি তীক্ষ্ণ তীরফলক। চমকে উঠলো সবাই। দুর্গেশ্বরী আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো দু'চোখে তার বিস্ময়।

দুর্গেশ্বরী নত হয়ে তীরটি তুলে নিলো হাতে; সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—দস্যু বনহুর।

দুর্গেশ্বরীর অনুচরগণও প্রতিধ্বনি করলো—দস্যু বনহুর।

হাঁ, এ তীর নিক্ষেপ করেছে দস্যু বনহুর। আশ্চর্য, আমার আস্তানায় দস্যু বনহুর প্রবেশ করলো কি করে? অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো—যাও, শীগ্‌গীর দেখো কোথায় সেই ভয়ঙ্কর দস্যু।

রাণীর আদেশের সঙ্গে সঙ্গে অনুচরগণ যেদিকে পারলো ছুটলো।

দুর্গেশ্বরী উন্মাদিনীর ন্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। দাঁত পিষে বললো—দস্যু বনহুর যখন আমার আস্তানার সন্ধান পেয়েছে তখন তাকে আর জীবিত রাখা যায় না। বাহরাম।

বলুন রাণীজী? অদূরেই ছিলো বাহরাম,এগিয়ে এলো।

দুর্গেশ্বরী বললো আবার— শোন বাহরাম, আমি আজই চাই—হয় জীবিত নয় মৃত দস্যু বনহুরকে।

আচ্ছা রাণীজী। বললো বাহরাম।

তখনই দুর্গেশ্বরী সবাইকে দরবারগৃহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলো।

অনুচরগণ তখনই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটলো যে যেদিকে পারে সেই দিকে।

দুর্গেশ্বরী যে মুহূর্তে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়েছে সেইক্ষণে তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো এক জমকালো মূর্তি দক্ষিণ হস্তে তার রিভলভার।

সম্মুখে যমদূতের মত ভয়ঙ্কর একটা মূর্তি দেখে দুর্গেশ্বরী ঘাবড়ে গেলো কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—কে তুমি?

আমি তোমার অতি পরিচিত জন—দস্যু বনহুর।

খিল খিল করে হেসে উঠলো দুর্গেশ্বরী—তুমিই তাহলে তীর নিক্ষেপ করেছো?

হাঁ, আমি।

জানো আমার আস্তানায় প্রবেশ করলে সে আর ফিরে যেতে পারে না।

আমি পারি।

না, পারবে না। তোমাকে আমি শুধু বন্দীই করবো না, তোমাকে আমি হত্যা করবো দস্যু বনহুর। কথা শেষ করে হাতে তালি দেয় দুর্গেশ্বরী—একবার দু'বার তিনবার।

কিন্তু কেউ আসে না।

এবার দুর্গেশ্বরীর মুখ কালো হয়ে উঠলো।

বনহুর হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ----তারপর হাসি বন্ধ করে বললো—কেউ আসবে না দুর্গেশ্বরী, সবাই বিশ্রাম করছে।

দুর্গেশ্বরী অবাক হয়ে তাকালো দস্যু বনহুরের মুখের দিকে।

দস্যু বনহুর বললো—এসো রাণী আমার সঙ্গে। দেখবে চলো আমার কথা সত্য কিনা।

দুর্গেশ্বরীর দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে, সে ক্রুদ্ধভাবে অগ্রসর হলো।

বনহুর যেন তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

দুর্গেশ্বরী কারাগার কক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই চক্ষুস্থির। বিস্ময় নিয়ে দেখলো তার সবগুলো অনুচর কারাগার কক্ষে বন্দী হয়ে খাঁচার পাখির মত ছট্‌ফট্ করছে।

দুর্গেশ্বরী ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকাতেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো, তার পিছনে যে স্থানে দস্যু বনহুর দাঁড়িয়ে ছিলো সে স্থান শূন্য।

দুর্গেশ্বরী নিজের কোমরের পিস্তলে এতক্ষণ হাত দেবার সুযোগ খুঁজছিলো কিন্তু পারেনি; দস্যু বনহুর তাকে সে সুযোগ দেয়নি। এবার দুর্গেশ্বরী পিস্তলখানা খুলে দাঁড়ালো কিন্তু কোথায় সেই মূর্তি।

দুর্গেশ্বরী নিজ হস্তে খুলে দিলো কারগার কক্ষ, তারপর ক্ষিপ্তের মত গুলি করে হত্যা করতে লাগলো এক-একজন অনুচরকে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো কারগার মেঝে।

এমন সময় দুর্গেশ্বরীর প্রধান অনুচর বাহরাম এসে দাঁড়ালো—রাণীজী ক্ষান্ত হন।

না, আমি ক্ষান্ত হবো না বাহরাম। এত হীন কাপুরুষ আমার অনুচরগণ আগে জানতাম না। আমি সবাইকে নিঃশেষ করে আবার নতুন দল গঠন করবো।

রাণীজী, আপনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছেন। আপনি জানেন না কতবড় শক্তিবান দস্যু বনহুর। তার শক্তিই শুধু নেই, বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ---

চুপ করো। আমার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ নেই বাহরাম। এক নিমিশে শত শত জীবন বিনষ্ট করতে পারি। আর আমার বুদ্ধিও দস্যু বনহুরের বুদ্ধির কাছে নিছক ক্ষীণ নয়। দস্যু বনহুরের আস্তানা আমি লুট করেছি। তার সব ধন-রত্ন হরণ করেছি লালারামের দ্বারা বুঝলে?

তা আমি জানি রাণীজী। কিন্তু নিছকভাবে এই অসহায় অনুচরদের হত্যা করা একেবারে অন্যায় হবে।

কিসে ন্যায়-অন্যায় আমি জানি না। জানতেও চাই না বাহরাম। আমি জানতে চাই কি করে দস্যু বনহুর এতগুলো জোয়ান দুর্দান্ত দুস্যুকে মেশ শাবকের মত কারাগারে ভরালো। আমি দরবারকক্ষে যাচ্ছি, যারা জীবিত

আছে নিয়ে এসো আমার সম্মুখে। কথা কয়টি বলে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেলো দুর্গেশ্বরী কারাগার থেকে।

❑

মহারাজ বাসুদেবের চোখে নিদ্রা নেই। তিনি কক্ষমধ্যে পায়চারী করে চলেছেন। চোখেমুখে তাঁর উদ্বিগ্নতার ছাপ বিদ্যামান। দুর্গেশ্বরী শুধু গোরী রাজ্যে অশান্তির সৃষ্টি করেনি, সমস্ত গোরীবাসীর মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে।

গতরাতের একটি ঘটনা বেশি করে ভাবিয়ে তুলেছে বাসু দেবকে। রাণী দুর্গেশ্বরী রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে হরিনাথের রাজপুত্র স্বপন কুমারকে হরণ করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু বিফল হয়েছে দুর্গেশ্বরী।

কাল গভীর রাতে হঠাৎ একটা আর্তচিৎকারে রাজবাড়ির সবাই জেগে উঠলো, চিৎকারটা যেদিক থেকে এসেছিলো সেই দিকে ছুটে গিয়ে সকলের চক্ষুস্থির! দেখলো তারা স্বপন কুমার তার কক্ষে মেঝেতে হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

বাসুদেবের আদেশে তাড়াতাড়ি স্বপন কুমারের হাত পা-মুখের বন্ধন উন্মোচন করা হলো।

ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে স্বপন কুমার, তার মুখোভাব রক্তশূন্য ফ্যাকাশে।

মহারাজ বাসুদেব স্বপন কুমারকে তার শয্যায় শুইয়ে দিয়ে পাশে এসে বসলেন, বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার? কে তোমাকে এভাবে হাত-পা-মুখ বেঁধে রেখে গেছে?

স্বপন কুমার কম্পিত কণ্ঠে বললো—মহারাজ সে এক ভীষণ চেহারার নারীমূর্তি---

বলো, বলো থামলে কেন, বলো?

আমার বড্ড ভয় করছে বলতে।

মহারাজ মনে মনে ভীত হলেও মুখে হাসি টেনে বলেন—তুমি এই ভয়ঙ্করী দস্যু নারীকে পাকড়াও করতেই তো এসেছো। আশ্চর্য হচ্ছি, এই সাহস নিয়ে তুমি তাকে কিভাবে পাকড়াও করবে?

স্বপন কুমার মাথা চুলকায়—তাই তো ভাবছি, কি করে এই নারীকে আমি পাকড়াও করবো। তবে আমার মন বলছে তাকে আমি পাকড়াও করতে পারবো।

এত দুঃখেও হাসি পেয়েছিলো মহারাজের।

গতরাতের এই ঘটনার পর কিছুতেই সাহস পাচ্ছিলেন না বাসুদেব, কখন যে আবার দুর্গেশ্বরী হানা দেবে কে জানে।

রাণী মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারের জন্য অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর মাতৃহৃদয়ে আশঙ্কা জেগেছিল যদিও স্বপন কুমার তাঁর পুত্র নয়, তবু তাকে স্নেহ করেন পুত্র সমতুল্য।

রাজকুমার মহাদেব আর স্বপন একই গৃহে শয়ন করে। রাণী দুর্গেশ্বরী মহাদেবকে হরণ করার চেষ্টা না করে স্বপন কুমারকে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করেছিলো বুঝতে পেরেছেন মঙ্গলা দেবী। তাই তিনি আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

আজ মহারাজ যখন নিদ্রাহীন চোখে বিশ্রামাগারে পায়চারী করছিল তখন রাণী মঙ্গলা এসে দাঁড়ালেন। স্বামীকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখে তিনি ব্যথিত হলেন। বৃদ্ধ স্বামীর অশান্তি তাকেও উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।

মঙ্গলা দেবী বিমর্ষ মুখে স্বামীকে লক্ষ্য করে বলেন—মহারাজ, এমনি করে আর কতদিন অশান্তি পোহাবেন?

গম্ভীর কণ্ঠে বলেন বাসুদেব—যতদিন শয়তানীদুর্গেশ্বরীকে আমি বন্দী করতে সক্ষম না হয়েছি।

কিন্তু সে রকম আশা তো দেখছি না। দুর্গেশ্বরীকে গ্রেফতার করার জন্য আপনি কত সৈন্য-সামন্ত কত পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন পুলিশ মহল অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সদা সর্বদা শহর প্রদক্ষিণ করে ফিরছে,প্রজারা প্রত্যেকে সজাগ পাহারা দিচ্ছে। তবু অজও কেউ রাণী দুর্গেশ্বরীকে পাকড়াও করতে সক্ষম হলো না, আর কিনা আপনি তাকে বন্দী করবেন।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে স্বপন কুমার—কেউ না পারলেও আমি পারবো মাসীমা।

চমকে ফিরে তাকালেন বাসুদেব এবং মঙ্গলা দেবী।

মঙ্গলাদেবী অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন—স্বপন তুমি।

হাঁ মাসীমা আমি।

তুমি এখানে---

আমার চোখেও ঘুম আসছিলো না, তাই ছাদে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন মঙ্গলা দেবী—প্রতীক্ষা করছিলে! কার প্রতীক্ষা করছিলে?

দুর্গেশ্বরীর!

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠে মঙ্গলা দেবীর মুখমণ্ডল কোনো অমঙ্গল আশঙ্কায় শিউরে উঠলেন তিনি বললেন—হতভাগা ছেলে, গতরাতের ঘটনার পরও তুমি রাণী দুর্গেশ্বরীকে পাকড়াও করার মত সাহস রাখো।

ঠিক সাহস নয় মাসীমা, দুঃসাহস রাখি।

কিন্তু---

এমনভাবে নাকানি-চুবানি খেয়েও আমি এমন দুঃসাহস করছি কি করে?

এবার কথা বলেন মহারাজ—হাঁ স্বপন কুমার এত বড় একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েও তুমি সেই ভয়ঙ্কর ইচ্ছা পোষণ করছো?

আমি যে আমার বাবা-মাকে কথা দিয়ে এসেছি।

তাতে কি যায় আসে। দেখো স্বপন তুমি ফিরে যাও বাবা ভালোয় ভালোয় তাহলে কতকটা নিশ্চিন্ত হই আমি। মঙ্গলা দেবী অত্যন্ত বিষণ্ন মনে কথা কয়টি বলেন।

বাসুদেবও যোগ দিলো পত্নীর কথায়—হাঁ তাই ভালো, হঠাৎ দুর্গেশ্বরী তোমার যদি কোন ক্ষতি করে বসে তখন আমি বন্ধুর কাছে কি উত্তর দেবো?

স্বপন কুমারের মনেও যে ভয়ের উদ্বেগ হয়নি তা নয়। মনোভাব গোপন করে বললো—এসেছি যখন তখন ফিরে যাবো না। আর্শীবাদ করুন মাসীমা যেন আপনাদের দুশ্চিন্তা দূর করতে পারি। কথাটা হৃষ্ট মনে বলে বেরিয়ে গেলো স্বপন কুমার।

বাসুদেব বললেন—রাণী, স্বপন কুমার সত্যিই একজন মহৎ হৃদয় যুবক।

তাতো নিশ্চয়ই কিন্তু ওর জন্য আমার বড় মায়া হয়। বেচারী আমাদের জন্য জীবন না হারায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে একখানা ছোরা এসে গেঁথে গেলো মহারাজ বাসুদেব আর মঙ্গলা দেবীর পায়ের কাছে।

ভয়চকিতভাবে বাসুদেব আর মঙ্গলা দেবী চোখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলেন।

বাসুদেবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে।

মঙ্গলা দেবীও কাঁপতে শুরু করেছেন।

বাসুদেব উবু হয়ে হাতে তুলে নিলেন ছোরাখানা।

মঙ্গলা দেবী বিহ্বল কণ্ঠে বললেন—দুর্গেশ্বরী রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছে।

ছোরাখানাতে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন মহারাজ—এ যে দেখছি দস্যু বনহুর।

মঙ্গলা দেবী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন—দস্যু বনহুর!

হাঁ রাণী। একটু থেমে বললেন আবার—এক দস্যুর আর্বিভাবে অস্থির হয়ে পড়েছি তারপর আবার দস্যু বনহুর! একি বিপদ দেখা দিল। ভগবান রক্ষা করো।

ঠিক সেইক্ষণে আচমকা একজমকালো মূর্তি এসে দাঁড়ালো মহারাজ বাসুদেব ও রাণী মঙ্গলা দেবীর দিকে। পা পা করে এগিয়ে এলো একেবারে সম্মুখে।

বাসুদেব আর মঙ্গলা দেবী ভয়ে থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছেন। তাঁদের দেহে জীবন আছে কিনা সন্দেহ। আতঙ্কভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছেন তারা জমাকালো মূর্তির দিকে।

বাসুদেব তাকিয়ে দেখলেন, কালো মূর্তির হস্তে উদ্যত রিভলভার। রিভলভার লক্ষ্য করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলেন মহারাজা এবং মহারাণী। কম্পিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন উভয়ে। কোন কথা তাঁদের কণ্ঠ দিয়ে বের হলো না।

জমকালো মূর্তি যে দস্যু বনহুর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মহারাজ এবং মহারাণীকে ভীত অবস্থায় দেখে হাসলো বনহুর, তারপর বললো—মহারাজ, ভগবান আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। তবে দস্যু বনহুরের কবল থেকে রক্ষার জন্য নয় রাণী, দুর্গেশ্বরীর হাত থেকে আপনাকে বাঁচানোর জন্য---

বাসুদেব ঢোক গিয়ে বললেন—তুমি, তুমিই দস্যু বনহুর?

হাঁ মহারাজ।

কেনো এসেছো আমার কাছে?

দুর্গেশ্বরীর কবল থেকে আপনাকে আর আপনার রাজ্য রক্ষার জন্য।

তুমি কি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী?

হ্যাঁ, আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুই বটে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যান ঘুমান। কিন্তু মনে রাখবেন, কোনো সময় যেন অসাবধান হবেন না।

বাসুদেবের চোখ দুটো বিস্ময়ে গোলাকার হয়, দস্যুর মুখে যেন তিনি অমৃতবাণী শুনছেন।

একটু আনমনা হয়েছেন, তাকিয়ে দেখেন দস্যু বনহুর কোথায় উধাও হয়েছে।

মঙ্গলা দেবী এতোক্ষণ আরষ্ট হয়ে ভয়ে কাঁপছিল। কোন কথা তাঁর মুখ দিয়ে যেন বের হচ্ছিলো না। এবার তিনি সজাগ হয়ে উঠলেন, বললেন—মহারাজ আশ্চর্য। কি করে এই রুদ্ধ কক্ষে দস্যু বনহুর প্রবেশ করলো?

তাইতো! আমিও সে কথাই ভাবছি। পাহারা পরিবেষ্টিত পাষাণ প্রাচীর ঘেরা এই দুর্গম রাজপ্রাসাদে কি করে সে প্রবেশ করলো? আরও কোথাই বা উরে গেলো এক মুহূর্তে?

মঙ্গলা দেবী ভীতকণ্ঠে বললো—মহারাজ, আমার বড্ড ভয় করছে।

চলো রাণী, তোমাকে তোমার কক্ষে পৌছে দিয়ে আসি।

চলুন মহারাজ।

বাসুদেব আর মঙ্গলা দেবী এগুলেন রাণী মহলের দিকে।

মহারাজ মঙ্গলা দেবীকে তাঁর কক্ষে পৌছে দিয়ে চলে গেলো নিজ বিশ্রামাগারে।

❑

পাশাপাশি দু'খানা খাটে শয়ন করে রয়েছে স্বপন কুমার ও রাজপুত্র মহাদেব। গভীর নিদ্রায় তারা অচেতন। কক্ষের একপাশে ত্রি-পায়ার উপরে মোমবাতি জ্বলছে। মোমটা জ্বলে জ্বলে প্রায় নিভু নিভু হয়ে এসেছে।

একটা আবছা ছায়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো সেই কক্ষে, মহাদেবের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো। ত্রি-পায়ার উপরের মোমের আলোতে ছায়াটির হস্তে চক্‌চক্ করে উঠলো একখানা ছোরা।

ছায়াটির সমস্ত শরীরে কালো কাপড় ঢাকা শুধু চোখের কাছে দু'টি মাত্র ছিদ্র। ছায়াটি নিদ্রিত মহাদেবের শয্যার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো তারপর উদ্যত করে ধরলো তার হস্তস্থিত ছোরাখানা।

কিন্তু পিছন থেকে কেউ যেন ধরে ফেললো ছোরাসহ ছায়ামূর্তির হাতখানা।

চমকে উঠলো ছায়ামূর্তি।

ততক্ষণে জেগে উঠেছে রাজপুত্র মহাদেব। সে শয্যায় উঠে বসতেই তার চক্ষুস্থির। একটি জমকালো মূর্তি তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে পিছনে স্বপন কুমার তার হাত থেকে ছোরা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে।

মহাদেব জেগে উঠতেই ছায়ামূর্তি ছোরাখানা স্বপন কুমারের হাতে ছেড়ে দিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেলো।

মহাদেব শয্যা ত্যাগ করে ছায়ামূর্তির পিছনে ধাওয়া করতে যাচ্ছিলো স্বপন কুমার বললো—যেও না মহাদেব।

ক্ষান্ত হলো মহাদেব।

স্বপন কুমারের পাশে এসে দাঁড়ালো, উভয়ে মোমের আলোতে দেখলো ছোরার বাটে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে— দস্যু বনহুর।

মহাদেব চিৎকার করে উঠলো—পাকড়াও করো---দস্যু বনহুর এসেছে। দস্যু বনহুর এসেছে---দস্যু বনহুর---

গভীর রাতে মহাদেবের ভয়ার্ত চিৎকারে চারদিক থেকে ছুটে এলো সবাই। সকলেরই মুখমণ্ডলে ভীত আতঙ্কিত ভাব।

রাজপ্রাসাদের সবাই এসে প্রায় জমায়েত হলো সেই কক্ষে; মহারাজ-মহারাণী তাঁরাও এসে হাজির হলেন। দস্যু বনহুর নাম লেখা ছোরা দেখে সবাই বুঝতে পারলো, দস্যু বনহুরই এসেছিলো মহাদেবকে হত্যা করতে।

সবাই যখন দস্যু বনহুরকে নিয়ে আলোচনায় মত্ত তখন মহারাজ নিজেও বুঝতে পারলেন নিশ্চয়ই এটা দস্যু বনহুর ছাড়া কেউ নয়, কারণ ছোরাখানাই তার প্রমাণ। মহাদেবকে কেন দস্যু বনহুর হত্যা করতে চেষ্টা করবে।

স্বপন কুমার ছোরাখানা অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে বললো—

—ছোরাখানা দস্যু বনহুরের সুনিশ্চয়, কিন্তু যে ছায়ামূর্তিটি মহাদেবের বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে যাচ্ছিলো সে পুরুষ নয়—নারী।

কক্ষমধ্যে সবাই চমকে উঠলো।

মহারাজ বললেন—নারী। তবে কি দস্যু বনহুর নারী?

স্বপন কুমার মাথা চুলকে বললো—আমার যতদূর ধারণা দস্যু বনহুর নারী নয়—সে পুরুষ---

মঙ্গলা দেবী অবাক কণ্ঠে বললেন—তবে যে বললে যে ছায়ামূর্তি মহাদেবের বুকে ছোরা বসাতে যাচ্ছিলো সে নারী?

হাঁ মাসীমা সে নারী—কারণ আমি তার হাত স্পর্শ করে বুঝতে পেরেছি সে হাত পুরুষের নয়—নারীর।

আশ্চর্য বটে। বললেন মহারাজ বাসুদেব।

স্বপন কুমার আবার বললো—আমাকে যে ছায়ামূর্তি হাত-পা-মুখ বেঁধে অনুচর দ্বারা নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলো, সেই ছায়ামূর্তিই মহাদেবকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো, আমার ধারণা ঐ ছায়ামূর্তিই রাণী দুর্গেশ্বরী!

একসঙ্গে বাসুদেব এবং মঙ্গলা দেবী অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ করে উঠলো—ছায়ামূর্তি রাণী দুর্গেশ্বরী!

হাঁ, আমার তাই মনে হয়। বললো স্বপন কুমার।

মহারাজ বাসুদেবের ললাটে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তারেখা, তিনি বলেন—কিন্তু কি করে তা সম্ভব হয় বলো স্বপন? ছায়ামূর্তি যদি রাণী দুর্গেশ্বরী হয় তাহলে ছোরার বাটে কি করে দস্যু বনহুরের নাম লেখা থাকবে?

স্বপন কুমার এবার দমে গেলো একেবারে, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললো—তাইতো!

সে রাত আর কারো চোখে ঘুম এলো না।

মহাদেব আর স্বপন কুমার জেগে রইলো নিজেদের ঘরে। মহারাজ এবং মঙ্গলা দেবীও জেগে রইলেন। রাজ প্রাসাদের চারদিকে সজাগ প্রহরী পাহারা দিতে লাগলো।

❑

কুয়াশাচ্ছন্ন গোরী পর্বত। পর্বতের পাথুরে পথ ধরে এগিয়ে চলেছে দু'টি অশ্বারোহী। এক দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ ফুটে উঠেছে তাদের চোখেমুখে। অশ্বারোহীদ্বয় কথাবার্তা বলতে বলতে অগ্রসর হচ্ছিলো।

দ্বিতীয় অশ্বারোহী প্রথম অশ্বারোহীকে লক্ষ্য করে বললো—সর্দার, রাণী দুর্গেশ্বরীর সন্ধান করতে গিয়ে আমাদের বহু সময় নষ্ট হয়ে চলেছে। কান্দাই

আস্তানা থেকে গত রাতে কায়েস ওয়্যারলেসে জানিয়েছে, কান্দাই-এর অবস্থা আবার পূর্বের আকার ধারণ করেছে। বড় বড় ব্যাবসায়িগণ ভেজাল মেশানো বস্তু বিক্রয় করে কোটি কোটি অর্থ মুনাফা করে চলেছে।

প্রথম অশ্বারোহী স্বয়ং দস্যু বনহুর।

দ্বিতীয় অশ্বারোহী তার সহচর রহমান।

উভয়ে এগিয়ে চলেছে তাদের গোরী আস্তানার দিকে। কুয়াশা ঢাক পথ বেয়ে দ্রুত অশ্ব চালনা সম্ভব নয়, তাই দস্যু বনহুর এবং রহমান অশ্বপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলো।

রহমানের কথায় বনহুর বললো—আর বেশি দিন ওরা এ সৌভাগ্য লাভ করতে সক্ষম হবে না রহমান। দুর্গেশ্বরীকে সায়েস্তা করেই আমি ফিরে যাবো কান্দাই, তারপর দেখে নেবো সব।

সর্দার, দুর্গেশ্বরীর সন্ধান তো পেয়েছেন, এবার তাকে খতম করে দিন।

রহমান, খতম করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু আমি প্রমাণ করতে চাই, কে এই দুর্গেশ্বরী, কি এর পরিচয় আর কিইবা এর উদ্দেশ্য। একটু থেমে বললো আবার বনহুর—রহমান, তুমি কান্দাই ফিরে যাও এবং অনুচরদের নিয়ে অনুসন্ধান করে দেখো সত্যিকারের শয়তান কারা—কারা লোকসমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে।

আচ্ছা সর্দার, তাই করবো।

কিছুক্ষণ নীরবে অশ্বচালনা করে চললো উভয়ে, তারপর বললো রহমান—সর্দার, ঐ সব শয়তান দল শুধু সমাজের মেরুদণ্ডই ভাঙ্গছে না, দেশের শত শত নাগরিকের বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছে। কান্দাই-এর পথে পথে অগণিত অসহায় জনগণ আবার না খেয়ে ধুকে ধুকে মরছে।

আমি জানি রহমান। বিভিন্ন কারণে আমাকে বহুদিন কান্দাই ত্যাগ করে থাকতে হয়েছিলো। কান্দাই-এর কোনো সন্ধান নেওয়া আমার সম্ভব হয়নি। কাজেই এমন হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কথায় কথায় একসময় তারা পৌঁছে গেলো গোরী পর্বতে দস্যু বনহুরের আস্তানায়।

আস্তানায় পৌঁছে বনহুর ও রহমান নেমে দাঁড়ালো নিজ নিজ অশ্ব থেকে।

তাজ আর দুলকীকে অন্যান্য অনুচর অশ্বশালার দিকে নিয়ে গেলো।

বনহুর আর রহমান প্রবেশ করলো আস্তানার মধ্যে। পাহারাদারগণ মাথা নত করে কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর ও রহমান সোজা দরবারকক্ষে এসে বসলো।

এমন সময় বনহুরের দু'জন অনুচর একটি বৃদ্ধকে নিয়ে হাজির করলো তাদের সম্মুখে।

রহমান বললো—এই বৃদ্ধ গোরী পর্বতের একটি গুহায় ধ্যানে মগ্ন ছিলো। সর্দার, একে আমাদের অনুচরগণ গুপ্তচর সন্দেহে পাকড়াও করে এনেছে।

মশালের আলোতে বনহুর ভালোভাবে তাকালো বৃদ্ধের দিকে। শুভ্র দাঁড়ি-গোঁফ ঢাকা প্রশান্ত একখানা মুখ। ললাটে চন্দনের আলপনা আঁকা, হাতে এবং বাজুতে রুদ্রাক্ষের মালা। দক্ষিণ হস্তে লৌহ চিমটা, বাম হস্তে ত্রিশূল।

বনহুর বৃদ্ধের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললো—সন্ন্যাসী বাবা, আপনি কি উদ্দেশ্যে গোরী পর্বতে ধ্যানরত ছিলেন?

সন্ন্যাসী তার মুদিত চক্ষুদ্বয় বিস্ফোরিত করে বললো—ভগবানের আরাধনায় মগ্ন ছিলাম। যারা আমার ধ্যান ভঙ্গ করেছে তাদের আমি অভিশাপ দেবো।

বনহুর বললো—সন্ন্যাসী বাবা, অভিশাপ দিয়ে বেচারাদের ক্ষতি করবেন না। আমি আপনাকে স্বস্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি।

সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধভাবে বলে উঠলো—না, আমি ক্ষমা করবো না তাদের। কারণ আমার ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় দেবতাগণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

হাসলো বনহুর, তারপর বললো—দেবতাদের খুশি করার ভার আমি গ্রহণ করলাম। আপনি যান, আপনাকে আমি মুক্তি দিলাম।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে তার আবাসে পৌঁছে দেবার জন্য আদেশ দিলো বনহুর।

অনুচরদ্বয় সন্ন্যাসী বাবাজীকে নিয়ে চলে গেলো।

রহমান বললো—সর্দার, আপনি ওকে মুক্তি দিয়ে ভুল করলেন।

না, ভুল করিনি রহমান, কারণ এই বৃদ্ধ কোনো গুপ্তচর নয়।

সর্দার!

হাঁ রহমান।

একি সত্যিই কোনো সন্ন্যাসী?

সন্ন্যাসী না হলে আমি নিজ হস্তে তাকে হত্যা করতাম।

কিন্তু তাকে এভাবে মুক্তি দেওয়া.....

ঠিকই হয়েছে রহমান। কাল তোমাকে এর কারণ বলবো।

মাথা নত করে রইলো রহমান, কোনো কথা বললো না।

আরও কিছুক্ষণ বনহুর আর রহমানের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হলো। তারপর বনহুর দরবারকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে।

রাত্রির অন্ধকার থমথম করছে চারদিক।

বনহুর নিজের বিশ্রামকক্ষের দিকে এগিয়ে চললো।

বনহুর নিজ কক্ষের দিকে প্রস্থান করলো, রহমান অনুসরণ করলো তাকে।

কিন্তু কক্ষের নিকটে এসে যখন কক্ষমধ্যে নজর ফেললো তখন দেখলো কক্ষ শূন্য—দরজা যেমন বন্ধ তেমনি আছে—সর্দার নেই। রহমান কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তারপর ছুটলো অশ্বশালার দিকে।

অশ্বশালায় পৌঁছে বিস্ময় আরও বাড়লো, তাজও নেই সেখানে। রহমান স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেই স্থানে। সর্দারের সঙ্গে তাজও উধাও হলো কোথায়!

❑

সেদিনের ঘটনার পর স্বপন কুমার প্রায়ই রাজপুত্র মহাদেবের কাছে কাছে থাকতো। সে বুঝতে পেরেছিল, দস্যু বনহুরের ছোরা নিয়ে রাণী দুর্গেশ্বরী তাকে হত্যার চেষ্টা করে চলেছে। তাকেও কম নাজেহাল-পেরেশান করেনি। স্বপন কুমারের মনে পড়ে, যেদিন সে রাজবাড়িতে প্রথম এলো সেই দিন রাতে কোনো এক নারী তার কক্ষে আগমন করেছিলো এবং তাকে হাত-পা-মুখ বেঁধে কোথাও চালান করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু কে সে নারী—তবে কি সেই দুর্গেশ্বরী?

আরও কোন সন্ধান পায়নি স্বপন কুমার রাণী দুর্গেশ্বরীর। হরিনাথপুর থেকে অনেক ভরসা নিয়ে স্বপন কুমার এসেছিলো, নিশ্চয়ই সে এই দুঃসাহসিক নারীটিকে গ্রেফতার করে গৌরী রাজ্যে নাম কিনবে কিন্তু এ ক'দিনেই হতাশ হয়ে পড়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, রাণী দুর্গেশ্বরীকে যতই

অবলা নারী বলে অবহেলা করুক, আসলে সে অবলা নয়। রীতিমত বুদ্ধিমতী সুকৌশলা রমণী।

একদিন স্বপন কুমার বাগানে বসে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলো, অল্পক্ষণ হলো মহাদেব চলে গেছে তার পাশ থেকে।

স্বপন কুমার মহাদেব সম্বন্ধেই ভাবছে, কিছুক্ষণ পূর্বে মহাদেব বলেছিলো—স্বপন দাদা, তুমি আছো তাই আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত। সত্যি তোমাকে পেয়ে আমার কত আনন্দ!

যদিও স্বপন কুমারের চেয়ে মহাদেব বয়সে বেশি ছোট নয় তবু মহাদেব স্বপন কুমারকে 'স্বপন দাদা' বলে ডাকে।

স্বপন কুমার ভালোবাসে, স্নেহ করে তাকে আপন সহোদরের মত। মহাদেবের অমঙ্গল আশঙ্কায় মহারাজ বাসুদেব এবং মঙ্গলা দেবী যেমন উদ্বিগ্ন তেমনি উদ্বিগ্ন স্বপন কুমার।

এই মুহূর্তেও স্বপন কুমার মহাদেব সম্বন্ধেই ভাবছিলো। সন্ধ্যার অন্ধকার এখনও জমাট বেঁধে উঠেনি। সূর্যাস্তের ক্ষীণ সোনালী আভার রেশ লেগে রয়েছে বাগানবাড়ির ফুলগাছের শাখায় শাখায়। দিনান্তে পাখীরা সব ফিরে এসেছে নিজ নিজ নীড়ে। পাখির কিচির মিচির কলরবে মুখরিত চারদিক।

স্বপন কুমার বাগানবাড়িতে একটি পাথরাসনে বসে ছিলো, উঠে দাঁড়ালো আনমনে।

এমন সময় পাশে নিজের কাঁধে কারো হাতের স্পর্শ অনুভব করে চমকে উঠলো স্বপন কুমার—রাণী মা আপনি!

স্বপন কুমার দেখলো মঙ্গলা দেবী দাঁড়িয়ে তার পাশে, চোখেমুখে তার আবেগভরা ভাব। স্বপন কুমারকে লক্ষ্য করে বললো মঙ্গলা দেবী—রাণীমা নয়, বলো মঙ্গলা!

রাণীমা!

স্বপন, এ বাড়িতে তুমি আসার পর আমার মনে তুমি আগুন জ্বেলে দিয়েছো। রাতে ঘুমোতে পারি না, দিনে বিশ্রাম করতে পারি না। আহারে রুচি নেই, সর্বক্ষণ শুধু তোমার কথা আমার সমস্ত মন জুড়ে আকুলি বিকুলি করে ফিরছে।

স্বপন কুমারের সুন্দর মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠেছে। মাথাটা আপনা আপনি নত হয়ে এসেছে, কোনো কথা সে উচ্চারণ করতে পারলো না।

মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালেন—স্বপন, কথা বলছো না কেনো?

স্বপন কুমার বিব্রত বোধ করছিলো, নত দৃষ্টি তুলে তাকালো সে মঙ্গলা দেবীর দিকে। মঙ্গলা দেবীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো স্বপন কুমারের। ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগলো সে ভিতরে ভিতরে। কণ্ঠটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো এবার সে অতি কষ্টে—আমি আপনাকে মাতৃসম শ্রদ্ধা করি.....

মঙ্গলা দেবী অভিমানভরা কণ্ঠে বললেন—আমি কি তোমার মাতৃসম বয়স্কা? আমি কি তোমার চেয়ে বয়সে দু'এক বছরের ছোট নই? বলো, বলো যদি তুমি আমার পুত্র হবার যোগ্য বয়স্ক হও তবে আমি তোমায়.....

এ বাড়িতে আসার পর আপনি আমাকে মাতৃস্নেহে.....

না না, তুমি বুঝতে পারোনি। মহাদেবের সঙ্গে থাকো বলে আমি তোমাকে তার মতই আদর-যত্ন করে থাকি কিন্তু আমি তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে পেতে চাই স্বপন।

আমাকে ক্ষমা করুন রাণীমা.....

আবার রাণীমা! স্বপন, জানো এ বাড়িতে তুমি আমার অনুগ্রহেই স্থান লাভ করেছো?

আপনার অনুগ্রহ হতে পারে কিন্তু আমার কোন স্বার্থ নেই এতে, বরং আপনাদেরই উপকার আছে। দুর্গেশ্বরীকে গ্রেফতার করার আশাতেই আমার আগমন, আর তাকে যদি গ্রেফতারে সক্ষম হই তাহলে আপনারাই উপকৃত হবেন।

আমি জানি তুমি পারবে না তাকে গ্রেফতার করতে।

যদি না পারি তাহলে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না। আমি দুঃখিত হবো।

ঠিক সেই মুহূর্তে কারো পদশব্দ শোনা যায়।

চমকে সরে দাঁড়ান মঙ্গলা দেবী, দেখতে পান মহারাজ বাসুদেব স্বয়ং সেদিকে এগিয়ে আসছেন।

স্বপন কুমার এতোক্ষণ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠে তার। এতোক্ষণ মঙ্গলা দেবীর সান্নিধ্যে যেন ঘেমে উঠেছিলো সে।

মহারাজ এসে দাঁড়ালেন—এই যে রাণী, তুমি এখানে! আমি তোমাকে খুঁজে ফিরছি। স্বপনের সঙ্গে আলাপ করছিলে বুঝি?

হাঁ মহারাজ, স্বপনের সঙ্গে গল্প করছিলাম।

তা আমাকে দেখে থামলে কেন? বলো, বলো কিসের গল্প হচ্ছিলো শুনি?

কি আর শুনবেন মহারাজ। স্বপন কুমার রাণী দুর্গেশ্বরীকে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না।

এ তো ভাল কথা! আমার মনে হয়, এই শয়তানীকে গ্রেফতারের জন্য এক আমি ভাবছি আর একজন সে ঐ স্বপন কুমার। সত্যি বাবা, তোমার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় আমাকে শুধু মুগ্ধ করেনি, আমি আত্মহারা হয়েছি। বন্ধুপুত্র হয়ে তুমি আমার একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। বেশ বেশ, তোমরা গল্প করো, আমিও বসছি তোমাদের সঙ্গে।

মহারাজ স্বপন আর মঙ্গলা দেবীর মাঝখানে বসে ছিলো তারপর বললেন—বসো তোমরা।

মঙ্গলা দেবীর মুখমণ্ডল গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠলো। স্বপন কুমারকে বেশ প্রসন্ন লাগছে এখন। স্বপন কুমার দাঁড়িয়ে রইলো কারণ মঙ্গলা দেবী আসন গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে আসন গ্রহণে সক্ষম হচ্ছিলো না।

মঙ্গলা দেবী বললেন—এখানে আর বিলম্ব করা শ্রেয় নয় কারণ সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে আসছে।

বাসুদেব মঙ্গলা দেবীর কথায় যোগ দিয়ে বললেন—হাঁ রাণী, ঠিকই বলেছো, দুর্গেশ্বরী যে কোন মুহূর্তে হানা দিতে পারে।

স্বপন কুমার কণ্ঠে সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে বললো—সাধ্য কি দুর্গেশ্বরী এখানে হানা দেয়! সেদিন পালাতে সক্ষম হয়েছে বলে আবার পালাবে, কখনোই না। আমি তাকে এবার পাকড়াও না করে ছাড়বো না।

মঙ্গলা দেবী বলেন—অতো সাহস দেখানো উচিত নয় স্বপন। দুর্গেশ্বরীর অসাধ্য কিছুই নেই, তার চেয়ে চলো এখন প্রাসাদে ফেরা যাক।

মহারাজ বাসুদেব ও রাণী মঙ্গলা দেবীসহ স্বপন কুমার রাজ-প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলো।

❑

দুর্গেশ্বরী সুউচ্চ আসনে উপবিষ্টা।

আসনের দু'পাশে দণ্ডায়মান দুর্গেশ্বরীর অনুচরগণ। প্রত্যেকের মুখে মুখোশ, হাতে সুতীক্ষ্ণ ধার বর্শা আর বল্লম।

সম্মুখে কয়েকজন বন্দী নরনারী হাতমুখ বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। আর রয়েছে স্তূপাকার মালপত্র। বন্দী নরনারীর মুখে অসহায় করুণ ভাব, কারো দেহের জামা-কাপড় ছিন্নভিন্ন, কারো বা প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ।

দুর্গেশ্বরীর সমস্ত শরীর কালো কাপড়ের আলখেল্লায় ঢাকা, শুধু চোখের কাছে দুটোমাত্র ছিদ্রপথ, ঐ ছিদ্রপথে দুর্গেশ্বরীর চোখ দুটো মশালের আলোতে জ্বলছিলো।

আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো দুর্গেশ্বরী। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে কিছু ইশারা করলো, তারপর আলখেল্লার ভিতর থেকে বের করে আনলো একখানা সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

মশালের তীব্র আলোতে ঝকমক করে উঠলো দুর্গেশ্বরীর হস্তের ছোরাখানা।

অনুচরগণ ততক্ষণে বন্দী নরনারীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

দুর্গেশ্বরী নেমে এলো তার আসন থেকে। অনুচরগণ তার পাশের দু'পাশে মাথা নত করে অভিনন্দন জানাতে লাগলো।

দুর্গেশ্বরী সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা হস্তে এগিয়ে আসছে বন্দী নরনারীদের দিকে। সেকি অদ্ভুত ভয়ঙ্কর মূর্তি!

বন্দী নরনারীর গায়ের রক্ত জমে বরফ হয়ে গেছে যেন, ছাই-এর মত ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখমণ্ডল, বলির পাঠার মত থর-থর করে কাঁপছে ওরা।

এখনও জানে না ওরা দুর্গেশ্বরী কেন তাদের দিকে এভাবে এগিয়ে আসছে।

বন্দী নরনারীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিকট চেহারার একটি পুরুষ। সমস্ত শরীর তার প্রায় উলঙ্গ। শুধুমাত্র একটা কাপড়ের টুকরা নেংটী আকারে লজ্জাস্থান ঢাকা রয়েছে। লোকটার কালো পাথরমূর্তির মত চেহারা তেল চক্‌চক করছে।

দুর্গেশ্বরী লোকটার নিকটে এসে ছোরাখানা ছুঁড়ে দিলো তার হাতে।

ভয়ঙ্কর লোকটা লুফে নিলো ছোরাখানা, পরক্ষণেই উন্মত্ত জানোয়ারের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো বন্দী নরনারীদের উপর—এক-এক আঘাতে নিহত করে চললো বন্দী নরনারীগুলোকে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো পাথুরিয়া মেঝেটা।

নিস্তব্ধ গুহায় এক-একটা তীব্র আর্তনাদ জেগে উঠে পর মুহূর্তেই আবার স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। সে এক বীভৎস-ভয়ঙ্কর নৃশংস দৃশ্য!

লোকটা যখন এক-এক জনের বুকে ছোরা বসিয়ে দিচ্ছিলো তখন দুর্গেশ্বরী হেসে উঠছিলো হাঃ হাঃ করে। নারীকণ্ঠের হাস্যধ্বনিতে গোরী পর্বতের গুহার দেয়ালগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিলো থরথর করে।

বন্দী নরনারীগুলোকে হত্যা করার পর দুর্গেশ্বরী ইংগিত করলো লাশগুলোকে বের করে নিয়ে যেতে।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন অনুচর রাণীর আদেশ পালন করতে লাগলো। একটি করে লাশ দু'জন অনুচর টেনে নিয়ে চললো।

দুর্গেশ্বরী পুনরায় আসন গ্রহণ করতেই স্তূপাকার মালপত্র হাজির করা হলো তার আসনের পাশে। একটির পর একটি করে খুলে মেলে রাখা হলো।

দুর্গেশ্বরী দেখার পর বললো—নিয়ে যাও, মালগুদামে মজুত করে রাখো।

কয়েকজন অনুচর মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

দুর্গেশ্বরী উঠে দাঁড়ালো তারপর তীব্রকণ্ঠে বললো—বাহরাম।

কুর্ণিশ জানালো বাহরাম—বলুন রাণীজী?

আজ আমি যাবো তোমাদের সঙ্গে।

জো হুজুর রাণীজী।

দুর্গেশ্বরী দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। শহরের দিকে এগিয়ে চললো তারা।

গোরী পর্বতের পাথরখণ্ডে অশ্বপদ শব্দ আছাড় খেয়ে ফিরতে লাগলো।

আজ দুর্গেশ্বরী শহরের সেরা ব্যাঙ্ক লুট করার উদ্দেশ্যে গমন করলো। সঙ্গে বাহরাম ও তার অন্যান্য অনুচর রয়েছে।

রাত্রি গভীর হওয়ায় পথঘাট নির্জন।

দুর্গেশ্বরীর অশ্ব তীরবেগে শহর অভিমুখে চললো।

ব্যাঙ্ক লুট করে নিয়ে ফিরে এলো দুর্গেশ্বরী। কিন্তু আস্তানায় প্রবেশ করার পূর্বেই সম্মুখে এসে দাঁড়ালো দস্যু বনহুর। তার দু'হাতে দু'খানা রিভলভার।

দস্যু বনহুর তার নিজস্ব দস্যু ড্রেসে সজ্জিত। মাথার পাগড়ী দিয়ে মুখের নিচ অংশটা ঢাকা রয়েছে।

দস্যু বনহুরের অগ্নিচক্ষু আর উদ্যত রিভলভার দু'টির দিকে তাকিয়ে দুর্গেশ্বরী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, এক পা এগুতে সাহস পেল না সে কিংবা তার অনুচরগণ।

দুর্গেশ্বরী দস্যু বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—দস্যু বনহুর?

হ্যাঁ আমি!

কি চাও?

ব্যাঙ্ক লুট করে যে অর্থ তুমি এনেছো।

অসম্ভব!

তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

আমাকে হত্যা করবে?

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

না, আমি প্রতিদিন তোমার মত কতজনকে হত্যা করে থাকি আর তুমি করবে আমাকে?

এই মুহূর্তে ব্যাঙ্ক লুট করা সমস্ত অর্থ আমাকে না দিলে আমি শুধু তোমাকেই নয়, তোমার প্রত্যেকটা অনুচরকে হত্যা করবো.....বনহুরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার রিভলভার দু'টি একসঙ্গে গর্জে উঠে।

তৎক্ষণাৎ তীব্র আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো দুর্গেশ্বরীর দু'পাশ থেকে দু'জন অনুচর। দু' একবার ছট্‌ফট্ করে নীরব হয়ে গেলো।

বনহুর হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে, তারপর বললো—কি, এখন দেবে না?

এবার দুর্গেশ্বরী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলো, সে দেখলো অমত করলেই আবার তার দু'টি অনুচর প্রাণ হারাবে। তা ছাড়া এমনভাবে গুহামুখ রুদ্ধ করে বনহুর দাঁড়িয়েছে কোনো দিকে সরার উপায় নেই। সম্মুখে অগ্রসর হলেও মৃত্যু, পিছন হটলেও রক্ষা নেই বনহুরের হাত থেকে। দুর্গেশ্বরী তার প্রধান অনুচর বাহরামের হাত থেকে টাকার থলে নিয়ে দস্যু বনহুরের হাতে ছুঁড়ে দিল।

দস্যু বনহুর টাকার থলেটা লুফে নিয়ে বললো—সাবাস! তারপর পিছু হটে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো। পরক্ষণেই গোরী পর্বতের পাথরে পাথরে প্রতিধ্বনি শুনা গেলো খট্ খট্ খট্.....খট্ খট্ খট্.....

দুর্গেশ্বরীর মুখ রাঙা হয়ে কালো হয়ে গেলো । ডাকাতির উপর ডাকাতি—দস্যু বনহুরের কাছে রাণী দুর্গেশ্বরীর এতোবড় পরাজয়! অনুচরদের আদেশ দিলো—এক্ষুণি ওর পিছু নাও।

তখনই কয়েকজন অনুচর অশ্ব নিয়ে ছুটলো দস্যু বনহুরের সন্ধানে কিন্তু বিফল হয়ে ফিরে এলো সবাই।

দুর্গেশ্বরী আসনে উপবিষ্টা হয়ে অধর দংশন করতে লাগলো। অনুচরগণ তার সম্মুখে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো, সকলের চোখেমুখেই গ্লানি আর পরাজয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। এই মুহূর্তে দস্যু বনহুরকে পেলে দুর্গেশ্বরী যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।

বনহুর দুর্গেশ্বরীর লুণ্ঠিত অর্থ লুটে নিয়ে শহরের নিকৃষ্ট বস্তিগুলোর মধ্যে এসে হাজির হলো। তাজকে এক স্থানে রেখে প্রবেশ করলো বস্তির মধ্যে।

সবে প্রভাত হয়েছে। ।

বস্তির শ্রমিকগণ রাতের অলসতা মুছে ফেলে জেগে উঠেছে সবাই। হাতমুখ ধুয়ে ছুটবে এবার সবে কল-কারখানা আর শহরের আনাচে-কানাচে কাজের আশায়। হয়তো কেউ কাজ পাবে, কেউ পাবে না। পথে পথে ঘুরে রিক্ত হস্তে ফিরে আসবে আবার তারা এই নিকৃষ্ট বস্তির বুকে। খাবার যদি কিছু ঘরে থাকে খাবে, নয় একবাটি পানি পান করে বস্তির স্যাঁতসেতে মেঝেতে খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাবে। আবার পরদিন জেগে উঠবে পাখি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে।

প্রতিদিনের মত আজ যখন বস্তির সবাই জেগে উঠলো তখন দেখলো তারা, কে এক দীপ্ত পুরুষ তাদের বস্তির মধ্যে এগিয়ে আসছে। অপূর্ব অদ্ভুত সুন্দর বলিষ্ঠ পুরুষ, হাতে তার অর্থভাণ্ডার।

সবাইকে ডাকলো বনহুর, তারপর সকলের মধ্যে রাণী দুর্গেশ্বরীর নিকট হতে লুটে নেওয়া অর্থগুলো সমান করে ভাগ করে দিলো। যারা উপার্জনে অক্ষম তাদের জন্য বেশি দিলো, যতদিন বাঁচবে বসে বসে যেন খেতে পায়।

শুধু বস্তিই নয়, গোরীর আনাচে-কানাচে যত দুঃস্থ-অসহায় ছিলো তাদের মধ্যেও প্রচুর অর্থ বিলিয়ে দিলো দস্যু বনহুর।

একটি ভিখারী বৃদ্ধ পথের ধারে বসে করুণ কণ্ঠে চিৎকার করছিলো—বাবা দুটো পয়সা দাও, খানা খাবো। বাবা দুটো পয়সা দাও, খানা খাবো.....

বনহুর তার পাশে এসে দাঁড়ালো, বৃদ্ধার মাথায় হাত বুলিয়ে এক থলে টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে চলে গেলো।

এমনি বহু দীন-দুঃখীর মধ্যে অর্থ বিলিয়ে দিতে লাগলো দস্যু বনহুর।

কেউ জানে না কে এই লোক, যে এত অর্থ দান করে চলেছে। কি এর পরিচয়!

রাণী দুর্গেশ্বরীর ভয়ে রাজ্যময় যেমন আতঙ্ক তেমনি অজানিত এক পুরুষের জন্য সবাই আকুল।

এ সংবাদ রাজদরবারে গিয়ে পৌঁছলো।

মহারাজ বাসুদেব আর মহারাণী মঙ্গলা দেবী রাজসিংহাসনে বসে আছেন, এমন সময় কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে নালিশ জানালেন, রাণী দুর্গেশ্বরী গোরী রাজ্যের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক হানা দিয়ে সব লুট করে নিয়ে গেছে। গোরী রাজ্যের বহুলোক একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন।

বাসুদেব তার মন্ত্রী এবং সেনাপতিকে লক্ষ্য করে বললেন—আপনারা কি করছেন? রাণী দুর্গেশ্বরীকে আজও আপনারা কেউ গ্রেফতার করতে সক্ষম হলেন না! সে দিনের পর দিন এমনভাবে দেশময় অত্যাচার আরম্ভ করেছে যার জন্য দেশবাসীর শান্তি সমূলে বিনষ্ট হয়েছে।

সেনাপতি উঠে দাঁড়ালেন—মহারাজ, আমরা কম চেষ্টা নেইনি। রাজ্যময় হাজার হাজার পাহারাদার মোতায়েন করা হয়েছে। সশস্ত্র সৈনিকগণ দিবারাত্র কড়া পাহারায় নিযুক্ত। এ সবের মধ্যেই দুর্গেশ্বরী তার কাজ চালিয়ে চলেছে।

রাজদরবারেই উপস্থিত ছিলো স্বপন কুমার, এবার সে উঠে দাঁড়ালো—মহারাজ, দুর্গেশ্বরী রাজ্যময় যতই অত্যাচারে লিপ্ত হউক তার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কারণ সে.....থামলো স্বপন কুমার।

রাণী মঙ্গলা দেবী বলে উঠলেন—স্বপন, থামলে কেনো, বলো? দুর্গেশ্বরীর আচরণে শুধু প্রজারাই নয়, আমিও অতিষ্ঠ। কারণ আমি রাজমাতা, প্রজাগণ আমার সন্তানসম।

কারণ সে নারী। যতই বুদ্ধিমতী আর বীরাঙ্গনা হউক তার মন দুর্বল, ক্ষণে ক্ষণে পরাজয় হবার সম্ভাবনা তার থাকবেই। কাজেই আমার মনে হয় তার কাজ শেষ হয়ে এসেছে।

মঙ্গলা দেবী খুশি হলেন, স্বপন কুমারের কথাগুলো তার মনকে আশ্বস্ত করে তুললো।

এমন সময় কয়েকজন সৈনিক দু'জন ভিখারীকে পাকড়াও করে আনলো।

একজন সৈনিক বললো—মহারাজ, এই ভিখারীদ্বয়ের নিকটে অনেকগুলো টাকা পাওয়া গেছে, পুলিশ প্রমাণ করেছে এ টাকা ঐ ব্যাঙ্কের টাকা। যে ব্যাঙ্ক গতপরশু রাতে রাণী দুর্গেশ্বরী দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিলো।

মহারাজ গর্জে উঠলেন—এরা নিশ্চয়ই দুর্গেশ্বরীর গুপ্তচর।

মহারাণী মঙ্গলা দেবীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হলো, রাজদরবারে দুর্গেশ্বরীর গুপ্তচর দেখে ক্রুদ্ধও হলেন তিনি। মঙ্গলা দেবী মহারাজকে লক্ষ্য করে বললেন—মহারাজ, এদের হত্যার আদেশ দিন, নিশ্চয়ই এরা, রাণী দুর্গেশ্বরীর গুপ্তচর।

মহারাজ বাসুদেব বলেন—হাঁ, আমারও সেই ধারণা। দুর্গেশ্বরীর গুপ্তচরই বটে, নাহলে ব্যাঙ্কের টাকা ওদের কাছে আসবে কি করে?

মহারাজের কথা শুনে কেঁদে ফেললো ভিখারীদ্বয়। ভিখারীদ্বয়ের মধ্যে একজন ছিলো সেই বৃদ্ধা ভিখারিনী, যাকে দস্যু বনহুর নিজ হস্তে দান করেছিলো অর্থের থলে।

প্রথম ভিখারী হাউমাউ করে কেঁদে বললো—আমি আমার ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, এ টাকা আমরা চুরি করিনি। একজন সুন্দর লোক আমাদের দিয়েছে। আমরা শয়তানী দুর্গেশ্বরীর গুপ্তচরও নই।

মঙ্গলা দেবীই বললেন এবার—মহারাজ, মিথ্যা কথা বলছে ওরা। চোর-ডাকু-দস্যু এরা কোনোদিন ঈশ্বরকে ভয় করে না, কাজেই ঈশ্বরের শপথ করা ওদের ছলনা।

স্বপন কুমার উঠে দাঁড়ালো—মহারাণী, আপনি যা বলছেন সত্য কিন্তু এই ভিখারীদ্বয় আসলেই চোর-ডাকু বা দস্যু কিনা তা প্রথমে না জেনে ওদের কোনরকম শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।

মহারাজ বললেন—হাঁ, স্বপন তুমি ঠিকই বলেছো। এরা ভিখারীও হতে পারে। কিন্তু এ অর্থ তারা পেলো কোথায়?

এবারও স্বপন কুমার জবাব দিলো—ভিখারীদ্বয় বলছে এরা দুর্গেশ্বরীর গুপ্তচর নয় আর অর্থগুলো দিয়েছে কোনো এক সহৃদয় ব্যক্তি। অথচ পুলিশ জানিয়েছে, এদের কাছে যে অর্থ পাওয়া গেছে তা গত পরশু রাতে ব্যাঙ্ক থেকে দুর্গেশ্বরী কতৃক লুণ্ঠিত টাকা।

হ্যাঁ, তুমি যা বলছো তা সত্য স্বপন।

তাই আমার মনে হয় দুর্গেশ্বরী এখন সৎপথে এসেছে। ব্যাঙ্ক লুট করার পর অনুশোচনা হয়েছে তাই সে তারই কোন অনুচর দ্বারা অর্থগুলো গোরী রাজ্যের অসহায় দুঃস্থ অনাথদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে।

মহারাজ গম্ভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। হয়তো তিনি ভাবছেন রাণী দুর্গেশ্বরীর তাহলে সুমতি হয়েছে।

মন্ত্রীবর উঠে বললেন—স্বপন কুমারের উক্তি ঠিক হতে পারে কিন্তু যতক্ষণ ভিখারীদ্বয়কে আসল ভিখারী বলে প্রমাণ করা না হয়েছে ততক্ষণ কারো কথাই সঠিক নয়। কাজেই ভিখারীদ্বয়কে আপাতত বন্দী করে রাখাই শ্রেয়।

মঙ্গলা দেবী মন্ত্রীবরের কথায় সায় দিয়ে বললেন—হাঁ, ভিখারীদ্বয়কে বন্দী করে রাখাই সমীচীন হবে।

সেদিনের মত দরবার ভঙ্গ হলো।

❑

নিস্তব্ধ নিকষ অন্ধকারে প্রাসাদের টানা বেলকুনি ধরে একটা আলখেল্লাধারী ছায়ামূর্তি এগিয়ে চলেছে মহারাজ বাসুদেবের কক্ষের দিকে। একসময় এসে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি বাসুদেবের কক্ষের দরজায়। আস্তে দরজা ফাঁক করে প্রবেশ করলো ভিতরে। সন্তর্পণে এগুলো মহারাজের শয্যার দিকে।

শয্যার পাশে এসে আলগোছে মহারাজের বালিশের নিচ থেকে বের করে নিলো একটা চাবী। চাবীটা হাতে নিয়ে তাকালো ছায়ামূর্তি কক্ষের চারিদিকে। তারপর যেমন সতর্কভাবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেছিলো তেমনি সর্তকতার সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

আলখেল্লাধারী এবার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো বাইরে। অন্ধকারে একটি অশ্ব অপেক্ষা করছিলো, আলখেল্লাধারী অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

অন্ধকারে উল্কাবেগে ছুটলো আলখেল্লাধারী।

রাজপ্রাসাদ ছেড়ে কয়েক মাইল দূরে কারাগার কক্ষ। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে আলখেল্লাধারী এসে পৌঁছলো বন্দীশালার সম্মুখে। প্রহরিগণের চোখে ধূলো দিয়ে অতি সাবধানে কারাগার মধ্যে প্রবেশ করলো, তারপর সন্তর্পণে এসে দাঁড়ালো একটি কারাকক্ষের সম্মুখে।

নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকালো এদিক ওদিক।

নিবু নিবু মশালের আলোতে দেখতে পেল পাহারাদারগণ বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

আলখেল্লাধারী তার আলখেল্লার মধ্য হতে বের করে আনলো দক্ষিণ হাতখানা, তারপর খুলে ফেললো কারাকক্ষের তালা।

এ সেই কারাকক্ষ যে কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে নিরীহ অসহায় ভিখারীদ্বয়কে। গভীর রাতে কারাকক্ষের মেঝেতে অঘোরে ঘুমাচ্ছে ওরা।

আলখেল্লাধারী নিদ্রিত ভিখারীদ্বয়ের পাশে এসে দাঁড়ালো, দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণধার একখানা ছোরা বের করে নিলো। যেমন আলখেল্লাধারী ছোরাখানা একজন নিদ্রিত ভিখারীর বুকে বসিয়ে দিতে যাবে অমনি পিছন থেকে কে যেন ছোরাসহ আলখেল্লাধারীর হাতখানা ধরে ফেললো।

মুহূর্তে আলখেল্লাধারী ফিরে তাকালো, অস্ফুটকণ্ঠে বললো—দস্যু বনহুর!

দস্যু বনহুর আলখেল্লাধারীর হাত থেকে ছোরাখানা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলো দূরে, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—নিরীহ ভিখারীকে হত্যা করে দস্যু বনহুরের প্রতিশোধ নিতে চাও দুর্গেশ্বরী? হাঃ হাঃ হাঃ এটাই বুঝি তোমার নীতি?

আলখেল্লাধারী নারী তাতে সন্দেহ নেই, কারণ তার কণ্ঠস্বরেই প্রমাণ পাওয়া গেছে।

দস্যু বনহুরের কথায় কোনো জবাব না দিয়ে কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় দুর্গেশ্বরী, পরক্ষণে শোনা যায় অশ্বখুরের শব্দ।

ততক্ষণে জেগে উঠেছিলো ভিখারীদ্বয়, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলো ওরা।

দস্যু বনহুর ভিখারীদ্বয়কে কারাকক্ষ থেকে মুক্ত করে দিলো—যাও তোমরা।

ভিখারীদ্বয় খুশি হয়ে বনহুরকে আশীর্বাদ করতে করতে বেরিয়ে গেলো।

প্রহরিগণ ততক্ষণে জেগে উঠেছে, তারা বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করলো বনহুরকে। বনহুর প্রস্তুত ছিলো, সে প্রহরিগণের আক্রমণের জবাব দিতে লাগলো।

দস্যু বনহুরের সঙ্গে পেরে উঠা কম কথা নয়, বনহুর এক এক আঘাতে এক একজনকে ভূতলশায়ী করে চললো, অল্পক্ষণেই সবাইকে পরাজিত করে বেরিয়ে গেলো দস্যু বনহুর।

কতকগুলো সৈন্য ছুটলো বনহুরের পিছু পিছু কিন্তু তারা বিফল হয়ে ফিরে এলো একসময়।

❑

পরদিন রাজদরবার লোকে লোকারণ্য।

রাজকারাগার থেকে ভিখারী বন্দীদ্বয়কে কে বা কারা মুক্ত করে নিয়ে গেছে, আর প্রহরিগণকে হত্যা করেছে। এই সংবাদ রাজ্যময় প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতাদের মধ্যে একটা বিপুল আগ্রহ জন্মেছে—কে সেই দেবপুরুষ যার হৃদয়ে এত মায়া! সামান্য দু'টি ভিখারীর জন্য যে নিজের জীবন বিপন্ন করে রাজকারাগারে প্রবেশ করতে সাহসী হয়েছিলো এবং সশস্ত্র প্রহরিগণকে হত্যা করে ভিখারীদ্বয়কে মুক্ত করে নিয়ে গেছে।

মহারাজ বাসুদেব আসনে উপবিষ্ট।

মন্ত্রী, সেনাপতি এবং অন্যান্য রাজপরিষদ নিজ নিজ আসনে অধিষ্ঠিত। সকলেরই মুখমণ্ডল অতীব গম্ভীর আশঙ্কাগ্রস্ত।

মহারাজ বাসুদেবের পাশেই রাণী মঙ্গলা দেবী উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর মুখমণ্ডলেও গাম্ভীর্যের ছায়াপাত ঘটেছে।

সবাই যখন গতরাতের ঘটনা নিয়ে আলাপ-আলোচনায় মত্ত তখন মহারাজ বাসুদেবের সম্মুখস্থ টেবিলে খচ করে এসে গেঁথে গেলো একখানা ছোরা।

একসঙ্গে চমকে উঠলো সবাই।

মন্ত্রীবর ছোরাখানা তুলে নিলেন হাতে, সংগে সংগে অস্ফুটকণ্ঠে বললেন—দস্যু বনহুর! মহারাজ দেখুন, ছোরার বাটে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে 'দস্যু বনহুর'।

মহারাজ বাসুদেব ছোরাখানা হাতে নিলেন। শুধু ছোরাই নয়, ছোরার সংগে গাঁথা রয়েছে একটি কাগজ। মহারাজ মন্ত্রীর হাতে কাগজখানা দিয়ে বললেন—পড়েন!

মন্ত্রীবর ভাঁজ করা কাগজখানা পড়তে শুরু করলেন—

মহারাজ,

গতরাতে ভিখারীদ্বয়ের ছদ্মবেশে আমিই আপনার কারাগার হতে মুক্ত করে দিয়েছি।

—দস্যু বনহুর

দরবারকক্ষে আবার একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠলো। মঙ্গলা দেবী উচ্চকণ্ঠে বললেন—সেনাপতি, এখনি রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করে ফেলার আদেশ দিন। নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর এই প্রাসাদের কোথাও আত্মগোপন করে আছে। তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসুন রাজদরবারে।

সেনাপতি উঠে মাথা নত করে অভিবাদন জানালেন তারপর আদেশ পালনে দ্রুত প্রস্থান করলেন দরবারকক্ষ থেকে।

মহারাজ বাসুদেব এতোক্ষণ ক্রুদ্ধভাবে দরবারে গত রাতের ভিখারীদ্বয়ের অন্তর্ধান নিয়ে পাহারাদারদের উপর কৈফিয়ৎ তলব করছিলো, যেইমাত্র তিনি ছোরাখানার গাঁথা চিঠির কথা জানতে পারলেন সেইমাত্র তাঁর মুখোভাব প্রসন্ন হয়ে এলো—তিনি বুঝতে পারলেন, এ কাজ দস্যু বনহুরের। মহারাজের চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠলো একটি জমকালো ছায়ামূর্তি, পাগড়ীর অংশে মুখের অর্ধেক ঢাকা, চোখে দীপ্তময় চাহনী। সুন্দর গম্ভীর কণ্ঠস্বর.....মহারাজ, ভগবান আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর

করেছেন, তবে দস্যু বনহুরের হাত থেকে রক্ষার জন্য নয়—রাণী দুর্গেশ্বরীর মৃত্যুছোবল থেকে বাঁচানোর জন্য.....

.....তুমি, তুমি কি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী?

.....হ্যাঁ, আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বটে.....

বাসুদেব রাণীর আচরণে মনে মনে ক্ষুণ্ন হলেন, কারণ দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করা তাঁর ইচ্ছা নয়।

দরবারকক্ষে সকলে ভয়কম্পিতভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলো, এখনি দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করে নিয়ে ফিরে আসবেন সেনাপতি। আশঙ্কা জাগছে সবার মনে, না জানি কেমন মূর্তি সেই দস্যুর।

কয়েক ঘণ্টা পর ফিরে এলেন সেনাপতি বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে। সকলেরই চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। হাঁপাচ্ছে সবাই, গা ঘেমে নেয়ে উঠেছে যেন তাদের।

দরবারকক্ষে প্রবেশ করে মহারাজ এবং মহারাণীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন সেনাপতি। তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্যান্য সৈন্য।

সেনাপতি বললো—সমস্ত রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করে ফেলা হয়েছিলো। সমস্ত প্রাসাদের প্রত্যেকটা জায়গা তন্ন তন্ন করে খোঁজ করা হলো কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না দস্যু বনহুরকে। স্বপন কুমার এবং রাজকুমার মহাদেব দস্যু বনহুরের সন্ধানে রাজপ্রাসাদের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে ফিরছে।

অল্পক্ষণ পর ফিরে এলো স্বপন কুমার ও রাজপুত্র মহাদেব, বিষণ্ন মুখোভাব উভয়ের।

মঙ্গলা দেবী বললেন—তোমরাও অপদার্থ! দস্যু বনহুর রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করে রাজদরবারে ছোরা নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায় আর তোমরা সবাই কি করো?

স্বপন কুমার আমতা আমতা করে বলে—আমরা কেমন করে জানবো দস্যু বনহুর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছে? ক্ষমা করুন, এরপর থেকে আমরা পাহারাদারদের সংগে পাহারা দেবো।

মহারাজ বললেন—তোমার কথা শুনে খুশি হলাম স্বপন। শুধু দস্যু বনহুর নয়, দুর্গেশ্বরীও যেন আমার প্রাসাদে প্রবেশ করে কোন অমঙ্গল ঘটাতে না পারে।

স্বপন কুমার মস্তক অবনত করে সম্মতি জানালো।
মহারাজ তাকে বসার জন্য আদেশ দিলো!

❑

মঙ্গলা দেবীর সখ তিনি নৌকা ভ্রমণে যাবেন। সঙ্গে যাবেন মহারাজ বাসুদেব আর স্বপন কুমার।

রাণীর সখে বাধা দিতে পারলেন না মহারাজ। কারণ তাঁর আদরিণী রাণীর জন্য তিনি সব করতে পারেন। তবে দেশের এই বিপদ মুহূর্তে মনে আশঙ্কা জাগছিলো, হঠাৎ দুর্গেশ্বরী কোনো অমঙ্গল ঘটিয়ে না বসে!

রাণী মহারাজের কোনো কথা শুনলেন না, যাবেনই। কাজেই মহারাজ বাধ্য হয়ে মন্ত্রীকে আদেশ দিলো নৌকাবিহারের জন্য নৌকা প্রস্তুত করতে।

একখানা নয়, কয়েকখানা নৌকা সাজানো হলো। অগণিত সৈন্য-সামন্ত নেওয়া হলো বিভিন্ন নৌকায়। সৈন্যরা সবাই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রয়েছে, যে কোনো দস্যু বা দস্যুরাণী হানা দিতে না পারে।

মঙ্গলা দেবীর কণ্ঠে রয়েছে বহুমূল্য একটি হীরককণ্ঠী। লক্ষ লক্ষ টাকা এর মূল্য।

মহারাজ অনেক করে বললেন— রাণী, এ কণ্ঠীহার আজ না পরাই ভালো, কারণ দুর্গেশ্বরী হানা দিতে পারে।

মঙ্গলা দেবী কোন কথাই শুনলেন না, কণ্ঠীহার তিনি গলায় পরলেন।

যাত্রা শুরু হবার পূর্বে নানারকম বাদ্যযন্ত্র সুর ছড়াতে লাগলো।

নদীতীর মুখর হয়ে উঠলো সে সুরের আবেশে। মহামান্য রাণী মঙ্গলা দেবী নৌকায় এসে বসলেন। এখনও মহারাজ বাসুদেব আর স্বপন কুমার এসে পৌঁছেননি নৌকার পাশে।

হঠাৎ একখানা তীর এসে গেঁথে গেলো রাণী মঙ্গলা দেবীর সম্মুখে নৌকার ভিতরে!

চমকে উঠলেন রাণী মঙ্গলা দেবী।

সঙ্গে সঙ্গে রাণীর নৌকার মাঝিমাল্লাগণ আতঙ্কিত ভয়চকিত হয়ে পড়লো। অন্যান্য নৌকায় সৈন্যসামন্ত ছিলো, তারা সবাই এসে ঘিরে ধরলো রাণীর নৌকাখানা।

রাণীর আদেশে কতকগুলো সৈন্য ছুটলো চারদিকে। কে এই তীর নিক্ষেপ করলো তারই অন্বেষণে।

ততক্ষণে মহারাজ এবং স্বপন কুমার এসে পৌঁছে গেছেন। মহারাজ ব্যাপার শুনে থ' হয়ে গেলেন। স্বপন কুমারের চোখেমুখে ফুটে উঠলো একটা ক্রুদ্ধভাব, সে তখনই তীরফলক হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো।

তীরফলক পরীক্ষা করে নিক্ষেপকারীর কোন হদিস পাওয়া গেলো না কারণ তীরফলকে কারোও নাম খোদাই করা ছিলো না। স্বপন কুমার বললো—এটা দস্যু বনহুরের কাজ।

মহারাজ বললেন—না, এ তীর নিক্ষেপ করেছে দুর্গেশ্বরী।

শেষ পর্যন্ত সৈন্যসামন্ত সবাই বিফল হয়ে ফিরে এলো, কেউ কোন সন্ধান আনতে পারলো না কে রাণীর নৌকায় তীর নিক্ষেপ করেছে।

মহারাজ আশঙ্কিত হয়ে ছিলো, এ যাত্রা কখনই শুভ হবে না বলে তিনি রাণীকে জানালেন।

রাণী যা জেদ ধরলেন তা থেকে ক্ষান্ত হবেন না, কাজেই একসঙ্গে সাতখানা নৌকা ভাসলো।

রাণীর নৌকার সম্মুখে এবং পিছনে চললো সৈন্য-সামন্ত ভরা নৌকাগুলো, মাঝখানো রাণীর নৌকা। সম্মুখের তিনখানা নৌকার মধ্যে সর্বাগ্রে যে নৌকাখানা চলেছে সে নৌকাখানায় রয়েছে শুধুমাত্র বাদ্যযন্ত্রসহ বাদকগণ।

নৌকা চলার তালে তালে বাদকগণ সুর ছড়িয়ে চলেছে। সূর্যাস্তের সোনালী আভায় নদীর পানি চিক্‌চিক্ করছে।

সারিবদ্ধভাবে নৌকা চলেছে।

বেলা ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাকাশে রূপালী থালার মত জেগে উঠলো পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোছনার আলোতে ঝলমল করে উঠলো সমস্ত পৃথিবী।

নদীর পানিতে ঢেউ-এর বুকে দোল খাচ্ছে আঁকাবাঁকা সাজের আকারে চাঁদখানা।

ছৈ-এর বাইরে এসে দাঁড়ালেন মহারাজ বাসুদেব আর মহারাণী মঙ্গলা দেবী।

স্বপন কুমার তখন বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো।

বৃদ্ধ মহারাজ বাসুদেব স্বপন কুমারকে নৌকার পাটাতনে বসে ঝিমুতে দেখে হাসলেন—রাণী, তুমি স্বপনকে সঙ্গে নিয়েছো বীরপুরুষ মনে করে কিন্তু ঐ দেখো সন্ধ্যারাতেই সে ঘুমে ঢলে পড়ছে।

মঙ্গলা দেবী মায়াভরা কণ্ঠে বললেন—আহা, বেচারী ছেলে মানুষ, একটু ঘুমিয়ে নিক। ফিরতে রাত হবে, তখন জেগে থাকবে।

মঙ্গলা দেবী আর মহারাজ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলো।

মহারাজ বললেন—রাণী, চলো নৌকার ভিতরে যাই।

মঙ্গলা দেবী ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বলেন—এই সুন্দর চাঁদকে আপনি অবহেলা করতে পারেন মহারাজ কিন্তু আমি পারি না। আমার সমস্ত মনপ্রাণ আজ উচ্ছল হয়ে উঠেছে!

মহারাজ আশঙ্কাভরা কণ্ঠে বললেন—তাতো বুঝলাম কিন্তু এরি মধ্যে ভুলে গেছো নৌকা ছাড়ার পূর্বে সেই অজ্ঞাত হস্তের নিক্ষিপ্ত তীরখানার কথা?

অবজ্ঞাভরে বললেন মঙ্গলা দেবী—ভুলে যাইনি মহারাজ। আমি জানি তীর নিক্ষেপকারী কে?

অবাক কণ্ঠে বললেন মহারাজ—জানো! তুমি জানো রাণী?

হাঁ মহারাজ, তীর নিক্ষেপ করেছে সেই শয়তান দস্যু বনহুর।

রাণী!

হাঁ।

দস্যু বনহুরকে তুমি শয়তান বলছো রাণী?

বলবো না? সে আমার বন্দীশালার ভিতরে প্রবেশ করে ভিখারী বন্দীদের মুক্তি দেয় কোন্ সাহসে?

রাণী আমার বন্দীশালা থেকে ভিখারীদ্বয়কে মুক্তি দিয়েছে দস্যু বনহুর—আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি আর তুমি পারলে না?

না, আমি দস্যু বনহুরকে ক্ষমা করবো না।

রাণী, জানো দস্যু বনহুর আমাদের একজন হিতৈষী বন্ধু?

আপনার হতে পারে আমার নয়।

রাণী! এ তুমি কি বলছো? সেদিন শয়তানী দুর্গেশ্বরীর ভয়ে তুমি আর আমি যখন কুঁকড়ে গিয়েছিলাম তখন দেবপুরুষের মত আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলো দস্যু বনহুর.....রাণী, মনে রেখো দুর্গেশ্বরী যদি আজ আমাদের উপর হামলা করে বসে তখন দেখবে মজাটা কেমন।

আপনি ভিতরে যান মহারাজ, আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দিন।

বেশ, তাই যাচ্ছি কিন্তু সাবধানে থেকো।

আচ্ছা।

মহারাজ নৌকামধ্যে প্রবেশ করলেন।

রাণী আকাশে পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অদূরে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে নাক ডাকাচ্ছে স্বপন কুমার।

মঙ্গলা দেবী ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, বোধ হয় করুণার হাসি। তারপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন স্বপন কুমারের পাশে।

হাঁটু গেড়ে বসে ডাকলেন মঙ্গলা দেবী—এই, ঘুমাচ্ছো?

ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলো স্বপন কুমার। চোখ রগড়ে লজ্জিতভাবে বললো—একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মাফ করবেন রাণী.....

মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারের ঠোঁটের উপরে তার সুকোমল আংগুলগুলো চাপা দিল—রাণী নয়, বলো মঙ্গলা দেবী।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে স্বপন কুমার, প্রথমে সে হাবা বনে গেলো, কোন কথা বললো না।

মঙ্গলা দেবীর চোখেমুখে একটা ভাবের উন্মেষ, আবেগভরা কণ্ঠে বললেন—স্বপন, দেখো কি সুন্দর চাঁদ।

আমতা আমতা করে বললো স্বপন কুমার—আমি দেখেছি মঙ্গলা দেবী।

স্বপন, তুমি গান জানো?

গান.....না না, আমি গান জানি না। তবে ছোটবেলায় একটু আধটু গাইতাম।

আজ একটা গান গাওনা কেন?

আমার গলার সুর শুনে নদীর মাছগুলো সব নৌকায় উঠে আসবে যে রাণীমা.....

আবার রাণীমা! বলেছি তুমি আমাকে মঙ্গলা বলে ডাকবে?

মঙ্গলা বলে? না, আমি মঙ্গলা বলে আপনাকে ডাকতে পারবো না, মঙ্গলা দেবী বলে ডাকবো।

বেশ তাই ডেকো। স্বপন?

বলুন মঙ্গলা দেবী?

জানো আজ কেন নৌকা ভ্রমণে এসেছি?

জানি।

জানো?

হাঁ।

বলো তো কেন?

মহারাজের মনে আনন্দ দেবার জন্য।

তুমি বড্ড অবুঝ। স্বপন, শুধু তোমার জন্য।

আমার জন্য?

হাঁ, তোমার জন্য।

কিন্তু আমি.....আমি বুঝতে পারছি না মঙ্গলা দেবী।

এটাই আমার দুঃখ, আজও তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পারলে না।

আপনি কি চান মঙ্গলা দেবী?

আমি চাই তোমাকে।

ঢোক গিলে বুকে হাত রেখে বললো স্বপন কুমার—আমাকে?

হ্যাঁ, আমি সব দেবো, সব দেবো তোমাকে। সমস্ত রাজ্য তোমার হবে স্বপন.....

আমি রাজ্য নিয়ে কি করবো?

হরিনাথ রাজ্যের অধিকারী তুমি, আবার গোরী রাজ্যের অধীশ্বর হবে.....

দুটো রাজ্য আমি কি করে চালাবো?

এত বোকা তুমি!

না না, ও আমি পারবো না।

এই সাহস নিয়ে তুমি এসেছো রাণী দুর্গেশ্বরীকে দমন করতে! প্রথমে আমি ভেবেছিলাম তুমি সত্যি বীরপুরুষ কিন্তু এখন দেখছি তোমার মধ্যে কিছু নেই! শুধু তোমার চেহারাটাই যা রাজ পুত্রের মত.....

সেজন্য আমি লজ্জিত। বললো স্বপন কুমার।

মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারের কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—স্বপন, তোমার বৃদ্ধ রাজাকেও আমি ত্যাগ করতে পারি।

ভয়ে শিউরে উঠলো স্বপন কুমার—রাণী বলে কি এসব! অন্তরে অন্তরে ঘৃণায় ভরে উঠলো তার মন। মঙ্গলা দেবীর প্রতি তার এতোদিন যে একটা শ্রদ্ধা ছিলো সব এক নিমিশে উবে গেলো। নৌকা ভ্রমণে রাণী-রাজার সঙ্গী হওয়ায় নিজকে অপরাধী মনে হচ্ছিলো তার।

চুপ করে বসে রইলো হতবুদ্ধি হয়ে।

মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারের কাঁধে হাত রাখলেন।

বিব্রত বোধ করলো স্বপন কুমার। উঠে দাঁড়ালো সে রাণীর সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য। কিন্তু রাণীকে এড়িয়ে যেতে পারলো না।

মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারের বুকে মাথা রেখে বললেন—পারবে আমাকে সুখী করতে?

স্বপন কুমার ঢোক গিললো, কোন জবাব সে দিতে পারলো না।

মঙ্গলা দেবী বললেন—জানো স্বপন, কত ব্যথা আর বেদনা আমার বুকে জমা হয়ে আছে?

রীতিমত ঘেমে উঠেছে স্বপন কুমার, বারবার রুমালে মুখ মুছছে সে।

মঙ্গলা দেবীর অধরখানা তখন স্বপন কুমারের অধরে এসে ঠেকেছে।

এমন সময় নৌকার মধ্য হতে শোনা যায় মহারাজের কণ্ঠস্বর—মঙ্গলা, ভিতরে এসো।

মঙ্গলা দেবী এবার স্বপন কুমারের নিকট হতে ভিতরে চলে যান, কতকটা বাধ্য হয়েই যান তিনি।

নৌকার ভিতরে এসে মহারাজের পাশে বসলেন—আমাকে ডাকছেন মহারাজ?

হাঁ রাণী, এক একা ভাল লাগছিলো না। তা ছাড়া এবার ফেরা যাক, কি বলো?

এতো ভীতু আপনি! চলুক, আরও কিছুটা চলুক—নৌকার দোলায় আমার ঘুম পাচ্ছে। মঙ্গলা দেবী স্বামীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন, তারপর বললেন—আপনি ও ঘুমান মহারাজ, আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

বেশ, তাই দাও। মহারাজ বাসুদেব স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করলেন।

মঙ্গলা দেবী স্বামীর চুলবিহীন চক্‌চকে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে চললেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রার কোলে ঢলে ছিলো মহারাজ বাসুদেব। জ্যোছনা রাতের ফুরফুরে বাতাসে আর নৌকার মিষ্টি মিষ্টি দোলায় নাক ডাকতে শুরু করলো তাঁর।

রাণী মঙ্গলা দেবী এবার সোজা হয়ে বসলেন তারপর শিস্ দিলো সন্তর্পণে।

সংগে সংগে নৌকার খোলসের মধ্য হতে বেরিয়ে এলো কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য! তারা নৌকার ভিতরে প্রবেশ করতেই মঙ্গলা দেবী ইংগিত করলেন মহারাজকে বেঁধে ফেলতে।

আদেশ পালন করলো সশস্ত্র সৈন্যগণ।

মহারাজের হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেললো তারা, তারপর রাণী মঙ্গলার আদেশে ওরা তুলে নিলো মহারাজকে কাঁধে। নৌকার বাইরে এনে আলগোছে নৌকা থেকে রাজাকে নদীর পানিতে ছেড়ে দিলো।

ঝুপ্ করে সামান্য একটু শব্দ হলো কিন্তু সে শব্দ কারো কানে পৌঁছলো না, দাঁড়ের শব্দের সংগে মিশে গেলো শব্দটা।

❑

চোখ মেলে তাকালেন মহারাজ, পাশে উপবিষ্ট সেই জমকালো মূর্তি। মহারাজের চিনতে বাকি রইলো না, এ সেই লোক যে একদিন গভীর রাতে

রাজপ্রাসাদে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছিলো। ভয়ে আড়ষ্ট হয়েছিলো মহারাজ এবং মঙ্গলা দেবী, তখন ছায়ামূর্তি বলেছিলো.....ভয় নেই মহারাজ, আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী।

মহারাজ যখন চোখ খুলে চাইলেন তখন ছায়ামূর্তির মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্তময় হয়ে উঠেছে।

মহারাজ বললেন—আমি কোথায়?

ছায়ামূর্তি বললো—দস্যু বনহুরের আস্তানায়।

তুমি—তুমিই সেদিন আমার রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলে?

হাঁ আমি।

তুমি দস্যু বনহুর?

হাঁ, আমি দস্যু বনহুর।

কিন্তু তুমি না আমাকে বলেছিলে, তুমি আমার মঙ্গলকামী! আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু?

হাঁ, আমি আপনার বন্ধু।

তবে কেন আমাকে এভাবে নৌকা থেকে চুরি করে আনলে? আর কেনইবা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে? সত্যি আমি কোন অন্যায় করিনি!

জানি আপনি ন্যায়বান রাজা এবং সে কারণেই আমি আপনার বন্ধু। আর আপনি যা ভেবেছেন তা সত্য নয়। আজ আপনি অসুস্থ কাজেই সব বলবো না, পরে সব জানতে পারবেন।

বনহুরের ইংগিতে তার সম্মুখে গরম দুধের বাটি ধরা হলো।

বনহুর বললো—দুধ খেয়ে নীরবে ঘুমান।

রাজা বিনা বাক্যে দুধটুকু পান করলেন।

ঔষধপত্র খাইয়ে মহারাজ বাসুদেবকে সুস্থ করে তুললো দস্যু বনহুর।

যখন মহারাজ বাসুদেব জানতে পারলেন, রাণী মঙ্গলা দেবীর চক্রান্তেই তার এ অবস্থা—সেদিন রাণীর চক্রান্তেই তাকে হাত-পা-মুখ বেঁধে নদীবক্ষে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিলো তখন মহারাজের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো, তাঁর আদরিণী রাণী বিশ্বাসঘাতকিনী!

মহারাজ বাসুদেব ভীষণভাবে ক্রোধান্ধ হয়ে উঠলেন, রাণীর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠলেন তিনি।

দস্যু বনহুর মহারাজকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ক্ষান্ত হন মহারাজ, প্রতিশোধ নেবার সময় এলে তখন আমি আপনাকে বলে দেবো।

মহারাজ দস্যু বনহুরের গোপন আস্তানায় রয়ে গেলেন।

ওদিকে রাণী মঙ্গলা দেবী শোকে কাতর হয়ে পড়েছেন। শোক বস্ত্র পরিধান করে রাজসিংহাসনে উপবেশন করলেন।

প্রজাগণ তখন সবাই এসে জমায়েত হয়েছে রাজবাড়ির সম্মুখে। সবার চোখে অশ্রু, মুখমণ্ডলে বিষণ্ণতার ছাপ, কারণ তাদের রাজার আকস্মিক মৃত্যুতে তারা মর্মাহত শোকাতুর হয়ে পড়েছে।

রাণী মঙ্গলা দেবী দরবারকক্ষে সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর দু'পাশে দু'জন বসেছে, রাজপুত্র মহাদেব ও হরিনাথের রাজপুত্র স্বপন কুমার!

রাজপরিষদগণ নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। সকলেরই মুখোভাব করুণ বিষাদময়।

রাজপুত্র মহাদেব তো কেঁদেকেটে দু'চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। স্বপন কুমারের চোখেও অশ্রু, হাজার হলেও বৃদ্ধ মহারাজ বাসুদেবকে সে নিজের পিতার মতোই শ্রদ্ধা করতো।

মঙ্গলা দেবী সিংহাসনে উপবেশন করে শোকাতুর প্রজাদের ডাকলেন।

প্রজাগণ দরবারকক্ষে সমবেত হয়ে রাজমাতার চোখে অশ্রু এবং দেহে শোকাবস্ত্র দেখে মর্মাহত হলো। প্রায় অনেকেই আকুলভাবে কাঁদাকাটা করতে লাগলো।

রাণী মঙ্গলা দেবী উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। তিনি বাষ্পরুদ্ধ গলায় প্রজাদের সম্বোধন করে বললেন—বৎসগণ, আমি অতীব দুঃখিত আর শোকাতুরা হয়ে পড়েছি। হঠাৎ মহারাজের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। পূর্বে যদি এতটুকু জানতাম, এই নৌকা ভ্রমণ আমার বৈধব্য টেনে আনবে তাহলে আমি কিছুতেই এই অশুভ নৌকা ভ্রমণে গমন করতাম না! কথা বন্ধ করে আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মঙ্গলা দেবী।

মঙ্গলা দেবীর পিতা অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রীবর আজ দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বৃদ্ধ হবার পর থেকে রাজকার্যে বড় একটা যোগ দিতেন না। আজ কন্যার এই বিপদ মুহূর্তে না এসে পারলেন না। কন্যাকে রোদন

করতে দেখে বৃদ্ধ মন্ত্রীবরও অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে কন্যাকে সম্বোধন করে বলেন—কেঁদো না মা, যা ভাগ্যে ছিলো তাই ঘটেছে। এখন তাঁর পবিত্র আত্মার যেন সৎগতি হয় সেই চিন্তা করো। মহারাজ বাসুদেব ছিলো মহৎ এবং মহান ও ন্যায়পরায়ণ রাজা। প্রজাদের তিনি নিজ সন্তানের মত মনে করতেন। দীন দুঃখিগণ ছিলো তাঁর প্রিয়, কাজেই মহারাজের আত্মার মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধ-শান্তি করো। রাজ্যের সমস্ত গরীব দীনহীন প্রজাদের মধ্যে অর্থ এবং বস্ত্রাদি বিতরণ করো, এতে মৃত মহারাজের আত্মা তৃপ্তি লাভ করবে।

রাণী মঙ্গলা দেবী নীরবে মাথা নাড়লেন।

স্বপন কুমার বললো—মন্ত্রীবরের কথা মতই কাজ করা শ্রেয় মঙ্গলা দেবী।

স্বপন কুমার মঙ্গলা দেবীর অনুরোধেই তাকে আজকাল মঙ্গলা দেবী বলে ডাকে। স্বপন কুমারের মুখে নিজ নাম শ্রবণে আনন্দ পান তিনি।

প্রজাদের সান্ত্বনা বাক্যে বিদায় করলেন মহারাণী মঙ্গলা দেবী।

রাজ্যময় ঘোষণা করে দেওয়া হলো মহারাজের শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার কথা। দীন-দুঃখী-গরীব বেচারীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেলো, মহারাণী মঙ্গলা দেবী মহারাজের শ্রাদ্ধ-শান্তিতে নিজ হস্তে দান করবেন।

বিরাট ভোজের আয়োজন চলেছে।

রাজপ্রাসাদের প্রতিটি ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়েছেন। এই শ্রাদ্ধ-শান্তি প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলবে। হাজার হাজার লোকের আগমন হবে এই শ্রাদ্ধ।

মহারাজ বাসুদেবের শ্রাদ্ধ—কম কথা নয়।

❑

মহারাজের পাশে উপবিষ্ট দস্যু বনহুর।

বনহুর সম্মুখস্থ প্লেট থেকে আঙ্গুরের ঝোপগুলো তুলে নিয়ে মুখে ধরছিলো আর খেতে খেতে মহারাজের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলো।

মহারাজের মুখমণ্ডল গম্ভীর, ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে। আজ গোরী রাজ্যের সবাই জানে নৌকা ভ্রমণে গমন করে মহারাজের মৃত্যু ঘটেছে। তিনি যে এখনও পৃথিবীর বুকে সশরীরে বিরাজ করছেন, এ কথা এক দস্যু বনহুর আর রহমান কাহিনী ছাড়া কেউ জানে না।

মহারাজ বাসুদেব বলেন—আমি বিশ্বাস করি না আমার প্রিয় রাণী মঙ্গলা বিশ্বাসঘাতকিনী! আমাকে কে নিজ জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসতো.....

বনহুর সোজা হয়ে বসলো, তারপর বললো—মহারাজ, আগামীকাল আপনি তার প্রমাণ পাবেন। আজ বিশ্রাম করুন।

পরদিন দস্যু বনহুর মহারাজসহ একটি গুপ্ত গুহায় প্রবেশ করলো। তারপর মহারাজকে এক সাধু বাবার বেশে সজ্জিত করে নিজেও তাঁর শিষ্য সাজলো। হাতে চিমটা, গলায় এবং বাজুতে রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে শ্বেত চন্দনের আল্‌পনা, মাথায় জটাজুট চুল।

বনহুর রহমানকে পূর্বেই একখানা গাড়ির ব্যবস্থা করতে বলেছিলো। মোটর গাড়ি বা কোন যন্ত্রচালিত গাড়ি নয়, ঘোড়া গাড়ি।

রহমান একখানা ঘোড়াগাড়ি এনে হাজির করলো।

বনহুর এবং মহারাজ ঘোড়াগাড়ির মধ্যে উঠে বসলেন।

রহমান কোচওয়ানের বেশে বসলো কোচ বাক্সে! সে গাড়ি খানাকে চালনা করে নিয়ে গেলো।

গোরী পর্বতের গা বেয়ে সরু পথ, সেই পথে অতি সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছিলো রহমান। হঠাৎ ঘোড়ার পা যেন পিছলে না যায়।

রহমান এবং দুস্য বনহুর ও মহারাজ বাসুদেবকে কেউ সহসা চিনতে পারবে না, তারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে ছদ্মবেশের আড়ালে।

মহারাজ বাসুদেব চিন্তিত মুখে বসে তাকিয়ে ছিলো বাইরের দিকে।

বনহুর বসে ছিলো তাঁর অপর পাশে, সেও বাইরে সুইচ্চ পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে ছিলো। বনহুরের দৃষ্টি মাঝে মাঝে বাসুদেবের মুখে ফিরে আসছিল, সে দেখছিলো রাজা বাসুদেবের মুখোভাব। সুপক্ক দাঁড়ি-গোঁফ এবং রাশিকৃত জটাজুট চুলের আড়ালে মহারাজ একেবারে বদলে গেছেন, চিনার উপায় নেই তাঁকে।

গাড়িখানা গোরী পর্বতের পাথুরিয়া পথের উপর দিয়ে হোঁচট খেয়ে খেয়ে দ্রুত ছুটে চলেছে।

বনহুর বললো—মহারাজ, কোথায় চলেছেন কিছু অনুমান করতে পেরেছেন?

মহারাজ বনহুরের মুখে দৃষ্টি রেখে বললেন—না, আমি এখনও কিছু বুঝতে পারিনি।

মহারাজ, আজ আপনি আপনার শ্রাদ্ধে চলেছেন।

শ্রাদ্ধ!

হ্যাঁ, আপনার শ্রাদ্ধক্রিয়া আজ সম্পূর্ণ হচ্ছে। রাজপ্রাসাদ আজ লোকে লোকারণ্য। রাণী মঙ্গলা দেবী স্বামীর মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হয়ে স্বামীর আত্মার শান্তির জন্য এই শ্রাদ্ধ-শান্তির আয়োজন করেছেন। শত শত দীন-দুঃখীকে মহারাণী নিজ হস্তে দান করবেন।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে মহারাজ বাসুদেব তাকিয়ে আছেন দস্যু বনহুরের মুখের দিকে—বলে কি সে! মৃত্যু না হতেই আমার শ্রাদ্ধ-শান্তি হচ্ছে? হায় ভগবান, একি শুনছি.....বলে উঠলেন মহারাজ!

বনহুর শান্তকণ্ঠে বললো—শুনছেন নয়, এবার দেখবেন চলুন।

একসময় গোরী পর্বতের পাথুরিয়া পথ ছেড়ে রাজপথে এসে ছিলো তাদের গাড়িখানা। রাজ্যমধ্যে পৌঁছতেই মহারাজ দেখতে পেলেন অগণিত লোকজন এবং সাধু-সন্ন্যাসী রাজ প্রাসাদ অভিমুখে সারিবদ্ধভাবে চলেছে।

গাড়ি রাখতে বললো বনহুর।

রহমান গাড়ি রুখলো।

বনহুর একদল সাধু বাবাজীকে ডেকে বললো—বাবাজী, আপনারা কোথায় চলেছে?

সন্ন্যাসিগণ বলেন—তোমরা কোন্ রাজ্যে বাস করো? শোনোনি আজ আমাদের মৃত মহারাজ বাসুদেবের শ্রাদ্ধ-শান্তি হচ্ছে। আমরা সেখানেই চলেছি।

সন্ন্যাসী বাবাজীর কথা শুনে মহারাজ বাসুদেব দু'হাতে মাথা চেপে ধরলেন। জীবিত থেকেও নিজের মৃত্যু-সংবাদে তাঁর মাথাটা ভনভন করে ঘুরে উঠলো।

বনহুর গাড়ি ছাড়ার জন্য রহমানকে আদেশ করলো। জনমুখর রাজপথ ধরে দস্যু বনহুরের গাড়িখানা এগিয়ে চলেছে।

বনহুর বললো—মহারাজ, এবার আপনি বিশ্বাস করছেন তো?

মাথা দোলালেন মহারাজ, বলেন—হাঁ বনহুর, তোমার কথা যে মিথ্যা নয় এখন তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি।

আরও পারবেন অপেক্ষা করুন মহারাজ। এখন আমাদের গাড়িখানা রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে এসে গেছে, আমাদের নামতে হবে।

গাড়ি রুখলো রহমান।

বনহুর মহারাজ বাসুদেবসহ নেমে পড়লো। রহমানকে গাড়িসহ নিভৃত একস্থানে অপেক্ষা করতে বলে তারা প্রসাদ অভিমুখে রওনা দিলো।

আরও বহু দীন-দুঃখী চলেছে, তাদের দলে মিশে গেলো মহারাজ বাসুদেব আর দস্যু বনহুর। তারাও দীনহীন অনাথের মত ভীড়ের মধ্যে এগিয়ে চললো।

রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন প্রাচীর-ঘেরা একস্থানে মহারাণী মঙ্গলা দেবী গরিবদের মধ্যে নিজ হস্তে দান করে স্বামীর পুণ্য কামনা করবেন।

প্রাসাদের সম্মুখ আঙ্গিনায় শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজনে রত। দলের মধ্যে মহারাজ বাসুদেব স্বয়ং এসে বসলেন, পাশে বসলো দস্যু বনহুর।

মহারাজ বাসুদেব ও বনহুর খেতে শুরু করলো।

মহারাজ বাসুদেবের কানে এলো, তার অদূরে কোন দীনহীন গরিব বেচারী খেতে খেতে বলছে—হে ভগবান, তুমি মহারাজের আত্মার শান্তি দিও!

বনহুর খাবার চিবুতে চিবুতে তাকালো মহারাজের মুখের দিকে।

মহারাজের মুখ কালো হয়ে উঠেছে, খাবারসহ হাতখানা তাঁর থেমে গেছে মাঝপথে। এসব কি শুনছেন তিনি, আর দেখছেন। মহারাজ উঠে দাঁড়ালেন, ক্রুদ্ধভাবে চিৎকার করে বলতে চাইলেন—আমি মরিনি....সব মিথ্যা, সব মিথ্যা.....

কিন্তু মহারাজের কণ্ঠ দিয়ে কিছু উচ্চারণ হবার পূর্বেই বনহুর মহারাজকে টেনে বসিয়ে দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়ভাবে মহারাজের মুখ চেপে

ধরলো—সব নষ্ট করতে যাচ্ছেন মহারাজ! সব নষ্ট করতে যাচ্ছেন.....চাপাকণ্ঠে বললো সে কথাটা।

না না, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি রাণীর কাছে যাবো, শুনবো সব কথা.....

চুপ করুন, চুপ করুন.....

ততক্ষণে মহারাজ আর বনহুরের পাশে লোকজন জমা হয়ে গেছে।

সবাই বললো, কি হয়েছে, ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?

বনহুর শান্তকণ্ঠে বললো—কিছু হয়নি, এর মাথায় কিছুটা গণ্ডগোল আছে কিনা তাই.....

মহারাজসহ বনহুর শ্রাদ্ধমণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এলো ভীড় এড়িয়ে। ঘোড়াগাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো—মহারাজ, আরও দেখতেন, কিন্তু আপনি যেভাবে চিৎকার করতে যাচ্ছিলেন তাতে সবকিছু পণ্ড হবার যোগাড় হয়েছিলো। মহারাণী নিজহস্তে দীন-দুঃখীদের মধ্যে অর্থ এবং বস্ত্রাদি বিতরণ করবেন।

আমি যাবো সেখানে। আমাকে রাণীর কাছে নিয়ে চলো বনহুর, আমাকে রাণীর কাছে নিয়ে চলো।

কিন্তু আপনি নিজকে সংযত রাখতে পারবেন তো মহারাজ?

পারবো।

তা'হলে চলুন?

মহারাজসহ বনহুর আবার এলো প্রাসাদে, যে স্থানে রাণী মঙ্গলা দেবী নিজহস্তে অর্থ এবং বস্ত্রাদি বিতরণ করছিলো।

দীন-দুঃখীগণ ভোজনশেষে সারিবদ্ধভাবে রাণীর সম্মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে আর রাণী তাদের মধ্যে মুক্তহস্তে দান করে চলেছেন।

দস্যু বনহুর এবং মহারাজ রাসুদেব সারি মধ্যে এসে দাঁড়ালো।

মহারাণী মঙ্গলা দেবী তখন সুউচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান অবস্থায় অর্থ এবং বস্ত্রাদি বিতরণ করছেন।

মহারাজ আর বনহুর সারির মধ্যে অগ্রসর হয়ে রাণীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, হাত পাতলো তারাও অন্যান্য দুস্থদের সঙ্গে।

রাণী কাপড় এবং অর্থ নিয়ে দস্যু বনহুর ও মহারাজের হাতে দিলো।

রাণীর দেহে শোকবস্ত্র কিন্তু মুখোভাবে তেমন কোনো শোকের ছায়া নেই।

যদিও রাণী নিজকে শোকাচ্ছন্ন করে রাখার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হচ্ছিলো না তার মধ্যে। তার মনের আসল ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ছিলো।

বনহুর আর মহারাজ বাসুদেব বেরিয়ে এলো প্রাসাদ থেকে। বাইরে এসে বস্ত্র এবং অর্থগুলো তারা দিয়ে দিলো ভিখারীদের মধ্যে।

ভিখারী অবাক হলো প্রথমে, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—তোমরা এসব দিয়ে দিলে কেন ভাই?

মহারাজ এবং বনহুর ভিখারীদের কথায় কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলো।

আবার ফিরে এলো মহারাজ দস্যু বনহুরের সঙ্গে তার আস্তানায়।

মহারাজের মনে শান্তি নেই, সদা-সর্বদা তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তিনি ভাবতেও পারেননি তাঁর প্রিয়তমা রাণী মঙ্গলা দেবী এত হৃদয়হীন পিশাচিনী। তাঁকে আদর দিয়ে নৌকা ভ্রমণে এনে হত্যা করার ফন্দি এটেছিলো! কি উদ্দেশ্য আছে যার জন্য মঙ্গলা দেবী স্বামীহত্যা করলো? মহারাজ যত ভাবেন ততই বেশি উন্মত্ত হয়ে উঠেন! কেন কেন তাঁকে এভাবে হত্যা করলো! যদিও মহারাজের মৃত্যু ঘটেনি কিন্তু লোকসমাজে তিনি মৃত। তাঁকে হত্যাই করে ফেলেছে রাণী মঙ্গলা। এ বেঁচে থাকা না থাকার মতোই।

নির্জন একটি গুহায় মহারাজের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহারাজের যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য বনহুর তার গোরী আস্তানার অনুচরগণের প্রতি ভালোভাবে নির্দেশ দিয়েছে।

যদিও মহারাজ বাসুদেবের কোনো অসুবিধা হচ্ছিলো না এখানে, তবু তাঁর অন্তরে সদা-সর্বদা দাহ হয়ে চলেছে। তিনি অহরহ অশান্তি আর দুশ্চিন্তায় ছটফট্ করছেন।

বনহুর যতক্ষণ তাঁর পাশে থাকে ততক্ষণ অনেকটা নানারকম কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত হয়। আর যখন তিনি একা থাকেন তখন একেবারে দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়েন। কিন্তু কোন

উপায় নেই, বনের পশুকে যেমন খাঁচায় বন্দী করলে তার অবস্থা হয় তেমনি অবস্থা হয়েছে মহারাজ বাসুদেবের।

শত শত প্রজার যিনি ভাগ্যনিয়ন্তা তিনি কিনা আজ দস্যু বনহুরের গুপ্ত গুহায় অস্বাভাবিকভাবে কালযাপন করে চলেছেন।

এদিকে রাজাহারা রাজ্যে দস্যুরাণী দুর্গেশ্বরী সুযোগ পেয়ে বসলো, চরম আকার ধারণ করলো সে। প্রতিরাতে রাজ্যের এখানে সেখানে হানা দিয়ে লুটতরাজ করে চললো!

ঐশ্বর্য আর অর্থ নিয়েও দুর্গেশ্বরী ক্ষান্ত হতো না, অযথা লোকজনদের ধরে নিয়ে যেতো এবং তাদের নির্মমভাবে হত্যা করতো।

❑

প্রজাগণ মহারাজের শোকে মুহ্যমান তদুপরি আবার দুর্গেশ্বরীর এই চরম উপদ্রব, অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো সবাই।

কার কাছেই বা নালিশ জানাবে, কেই বা দুর্গেশ্বরী দমনে এগিয়ে আসবে।

একমাত্র স্বপন কুমার দিবারাত্র সব সময় দুর্গেশ্বরীর সন্ধানে নানা জায়গায় নানাভাবে অন্বেষণ করে ফিরছে। মঙ্গলা দেবী তাকে সৈন্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে যথাযথভাবে সাহায্য করে চলেছেন। অবশ্য মঙ্গলা দেবীও দুর্গেশ্বরীর জন্য সদা আশঙ্কিত হয়ে পড়েছেন, না জানি কখন সে তার রাজ প্রাসাদে হানা দিয়ে বসে।

আজকাল প্রায়ই মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারের সঙ্গে নির্জনে বসে রাণী দুর্গেশ্বরী সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে থাকেন। কিভাবে তাকে গ্রেপ্তার করা যায়, কিভাবে তাকে বন্দী করে রাজ্যের শান্তি ফিরে আনা যায়। শুধু তাই নয়, দস্যু বনহুরকেও গ্রেফতার করতে হবে, তা নাহলে রাজ্যের শান্তি ফিরে আসবে না।

স্বপন কুমার মঙ্গলা দেবীর কথা মতোই কাজ করে। রাণীর পরামর্শ ছাড়া তার আজকাল একেবারে চলেই না। প্রথম কেমন বোকা বোকা ছিলো এখন আগের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান হয়েছে সে।

স্বপন কুমার আর মহাদেব একই কক্ষে ঘুমায়।

কিন্তু রাণীর ইচ্ছা নয় স্বপন কুমার মহাদেবের ঘুরে ঘুমাক। রাণী অনেক বলা সত্ত্বেও স্বপন কুমার তার কথায় রাজি হয়নি। এজন্য মঙ্গলা দেবী তার প্রতি ক্ষুণ্ন হয়েছেন মনে মনে।

সেদিন গভীর রাতে স্বপন কুমারের ঘুম ভেঙ্গে গেলো, দেখলো পাশের বিছানায় মহাদেব নাই। স্বপন কুমার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছিলো—ব্যাপার কি! মহাদেব গেলো কোথায়? তাড়াতাড়ি স্লিপিং গাউন গায়ে পরে বেরুতে যাবে, এমন সময় তার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন মহারাণী স্বয়ং।

স্বপন কুমার চমকে উঠলো—আপনি! এতো রাতে?

কোথায় যাচ্ছো? মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন।

স্বপন কুমার বললো—মহাদেবকে দেখছি না তাই.....

ও, মহাদেবের খোঁজে যাচ্ছো?

হাঁ, কোথায় সে দেখতে যাচ্ছি।

মঙ্গলা দেবী মৃদু হেসে বললেন—মহাদেব আমার কক্ষে।

অবাক হয়ে বললো স্বপন কুমার—আপনার কক্ষে কেন?

আমি কোনো কাজে বাইরে যাবো বলে আমার কক্ষে আমার বিছানায় শয়ন করতে বলেছি.....

বাইরে! বাইরে কোথায় যাবেন আপনি?

পরে বলবো, এসো আমার সঙ্গে। এসো!

স্বপন কুমার বাধ্য হয়ে মঙ্গলা দেবীর সঙ্গে গমন করতে। মঙ্গলা দেবীর সংগে দু'জন পরিচালিকা ছিলো, তারা দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিলো। মঙ্গলা দেবী তাদের চলে যাবার জন্য ইংগিত করলো।

পরিচালিকা দু'জন চলে গেলো নিজদের বিশ্রামকক্ষের দিকে।

নির্জন এক স্থানে এসে দাঁড়ালেন মঙ্গলা দেবী, স্বপন কুমার তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলো। সে ভাবতে পারেনি, এত রাতে রাণী মঙ্গলা দেবী তাকে এমন নির্জন আধো অন্ধকার স্থানে নিয়ে আসবেন।

মঙ্গলা দেবী সরে এলেন স্বপন কুমারের দিকে ঘনিষ্ঠ হয়ে, ডাকলেন—স্বপন!

বলুন মঙ্গলা দেবী?

আর কতদিন তুমি আমাকে এভাবে জ্বালাবে বলো?

অবাক হয়ে বললো স্বপন কুমার—আপনি কি বলছেন মঙ্গলা দেবী ঠিক বুঝতে পারছি না?

স্বপন, আমার সমস্ত মনপ্রাণ তোমার জন্য জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তুমি কি আজও বুঝলে না আমার মনের কথা?

মঙ্গলা দেবী, আমাকে মাফ করুন মঙ্গলা দেবী।

স্বপন তুমি কি মানুষ নও? আমার মন যে তোমার জন্য আকুল তাকি তুমি বুঝ না?

স্বপন কুমার কি করবে বা কি বলবে ভেবে পায় না। পালাবার জন্য মন তার আকুলি-বিকুলি করে উঠে।

মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারের দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরেন—স্বপন, আমি বলেছি তুমি যা চাও তাই দেবো। সব দেবো তোমাকে!

স্বপন কুমার ঘামতে শুরু করেছে।

মঙ্গলা দেবী মাথা রাখে স্বপন কুমারের প্রশস্ত বুকে।

কতক্ষণ নীরবে কাটে উভয়ের, নির্জন বাগানবাড়ির আধো অন্ধকারে শুধু দুটি প্রাণী—মঙ্গলা দেবী আর স্বপন কুমার।

হঠাৎ এমন সময় অদূরে শোনা যায় কারো পদশব্দ, কোনো পাহারাদার বাগানবাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে বলেই মনে হলো।

রাণী মঙ্গলা দেবী বললেন—স্বপন, তুমি ঘরে ফিরে যাও, আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

স্বপন কুমার কোনো জবাব দেবার পূর্বেই মঙ্গলা দেবী অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

স্বপন কুমার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এগিয়ে আসে পাহারাদার, লণ্ঠন উঁচু করে ধরে বলে—কে ওখানে?

স্বপন কুমারের সংজ্ঞা যেন ফিরে আসে পাহারাদারের কণ্ঠস্বরে, বলে সে—আমি স্বপন কুমার।

পাহারাদার সসম্মানে মাথা নত করে কুর্ণিশ জানায় তারপর বলে—কুমার বাবু, আপনি!

হাঁ মহেশ, আমি।

রাজপ্রাসাদের সবাই জানে, স্বপন কুমার দুর্গেশ্বরী এবং দুস্য বনহুর গ্রেফতারের জন্যই রাজ প্রাসাদে আছেন এবং তিনি যখন-তখন এ প্রাসাদের সর্বত্র স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করতে পারেন।

পাহারাদার চলে গেলো আপন কাজে।

স্বপন কুমার অগ্রসর হলো তার শয়নকক্ষের দিকে।

পাহারাদার এসে পড়ায় মঙ্গলা দেবী আড়ালে আত্মগোপন করেছিলো। পাহারাদার ও স্বপন কুমার চলে গেলে রাণী মঙ্গলা দেবী বাগানবাড়ি থেকে বেরিয়ে রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সন্তর্পণে এগিয়ে চললেন রাণীমহলের দিকে।

কক্ষে প্রবেশ করে দরজা ভেজিয়ে দিলো রাণী মঙ্গলা দেবী। টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কৌটা বের করলেন। তারপর টেবিলে ঢাকা একটি পানির গেলো াস তুলে নিয়ে কৌটা থেকে কিছুটা গুড়ো পাউডার মিশালেন।

পানির গেলাসটা পুনরায় ঢাকা দিয়ে এগিয়ে গেলো মঙ্গলা দেবী বিছানার দিকে।

খাটের উপর নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে রাজপুত্র মহাদেব।

মঙ্গলা দেবী ডাকলেন—বাছা, আমি এসেছি এবার উঠো। মহাদেব, মহাদেব বাছা উঠো.....

মহাদেবের নিদ্রা ভেঙ্গে গেলো, ধড়ফড় করে উঠে বসলো মহাদেব—মা, তুমি এসেছো?

মাতৃহীন মহাদেব মঙ্গলা দেবীকে মায়ের মতই শ্রদ্ধা করতো, তেমনি করতো বিশ্বাস। আজ গভীর রাতে হঠাৎ মা যখন তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন তখন সে কোনো কিছু মনে না করে মায়ের ঘরে এসে দাঁড়ালো, বলেছিলো—মা, তুমি ডেকেছো?

মঙ্গলা দেবী সজ্জিত হয়ে গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। উদ্বিগ্নভাবে পায়চারী করছিলো কক্ষমধ্যে।

মহাদেব এসে দাঁড়াতেই মঙ্গলা দেবী বললেন—বাছা, আমার কক্ষে শয়ন করো, আমি বিশেষ দরকারে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। অল্পক্ষণ পরই ফিরে আসবো।

মহাদেব বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেছিলো, বলেছিলো—আচ্ছা মা, তুমি যাও, আমি তোমার খাটে শয়ন করছি।

এক্ষণে মঙ্গলা দেবীকে ফিরে আসতে দেখে মহাদেব শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। ঘুমের ঘোরে চোখ দু'টো তার ঢুলুঢুলু করছে।

মহাদেব উঠে দাঁড়াতেই মঙ্গলা দেবী বললেন—বৎস, নিদ্রা ভংগের পর ঠাণ্ডা জল পান করতে হয়। মহাদেব, তুমি জল পান করে নিজ কক্ষে শয়ন করতে যাও।

মঙ্গলা দেবী টেবিল থেকে পানির গেলো াসটা নিয়ে বাড়িয়ে ধরে মহাদেবের সম্মুখে।

মহাদেব কোনোরকম সঙ্কোচ না করে পানির গেলাস হাতে নিয়ে যেমন মুখে ধরতে যায় অমনি তার গেলাসটা কিসের আঘাতে যেন ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

ভাঙ্গা গেলাসটা ছড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। পানিতে ভিজে যায় মহাদেবের জামাকাপড়।

মঙ্গলা দেবী চমকে উঠেন সঙ্গে সঙ্গে।

মহাদেবও বিস্মিত হতবাক, মুহূর্তে ঘুমাচ্ছন্ন ভাবটা ছুটে যায় তার চোখ থেকে।

মঙ্গলা দেবী এবং মহাদেব এক সঙ্গে ফিরে তাকায় পিছনে, ভীষণভাবে আঁতকে উঠে উভয়ে।

দক্ষিণ হস্তে রিভলভার জমকালো এক মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তাদের পাশে।

মঙ্গলা দেবী চিনতে পারেন কারণ মহারাজ বাসুদেব এবং তিনি যখন একদিন কক্ষমধ্যে রাণী দুর্গেশ্বরীর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছিলেন, তখন এই জমকালো মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছিলো—সেই হলো সাক্ষাৎ দস্যু বনহুর। মঙ্গলা দেবী অস্ফুটধ্বনি করে উঠলো—দস্যু বনহুর!

হাঁ মহারাণী, দস্যু বনহুর।

মহাদেব দস্যু বনহুরের নাম শোনামাত্র থরথর করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। ভীত দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে সে জমকালো মূর্তিটার দিকে। ভীত দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে সে জমকালো মূর্তিটার দিকে। হঠাৎ ভয়াতুর কণ্ঠে মহাদেব চিৎকার করতে যায়—পাহারাদার.....পাহারাদার.....

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর মহাদেবের বুকে রিভলভার চেপে ধরে বলে—খবরদার, চেঁচাবে না।

মঙ্গলা দেবী পালাতে যাচ্ছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য কোনক্রমে কক্ষ থেকে বেরুতে পারলে দস্যু বনহুরকে বন্দী করা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে না।

কিন্তু মঙ্গলা দেবী দরজার দিকে পা বাড়াতেই দস্যু বনহুর তার পথরোধ করে দাঁড়ালো, তারপর মহাদেবকে লক্ষ্য করে বললো—এসো মহাদেব তোমার শয়নকক্ষে চলো।

মহাদেব ও দস্যু বনহুর কক্ষ থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো। বনহুর বাইরে থেকে শিকল বন্ধ করে দিলো, মঙ্গলা দেবী যেন কক্ষ থেকে বের হতে না পারে।

দস্যু বনহুরের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে মহাদেব। একটি টু শব্দ তার মুখ দিয়ে বের হলো না।

চলতে চলতে বললো দস্যু বনহুর—মহাদেব, জানো এ মুহূর্তে তোমার মৃত্যু হতো?

থমকে দাঁড়ালো মহাদেব, কিন্তু কোনো কথা সে বলতে পারলো না।

বনহুর বললো—যে জল তুমি পান করতে যাচ্ছিলে তাতে বিষ মিশানো ছিল।

মহাদেব অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—বিষ!

হাঁ, তোমার মা তোমাকে হত্যা করার জন্য আগ্রহশীল। কাজেই তুমি সব সময় সাবধানে থাকবে। যাও, ঘরে গিয়ে শয়ন করোগে, যাও।

কথাটা বলে দস্যু বনহুর পিছন দিকে অন্ধকারে চলে যায়। মহাদেব বিস্মিত, হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের চলে যাওয়া পথের দিকে।

এক সময় সম্বিৎ ফিরে পায় মহাদেব, ভাবে একি! সে এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে আছে কেন? তাড়াতাড়ি নিজের শয়নকক্ষের দিকে পা বাড়ায়।

কক্ষে প্রবেশ করে তাকায় মহাদেব স্বপন কুমারের শয্যার দিকে। স্বপন কুমার তখন ঘুমাচ্ছে।

মহাদেব শয্যায় শয়ন করে বটে কিন্তু ঘুম তার চোখে আর আসে না। আজ রাত তার জীবনের এক চরম রাত। বারবার মনে পড়ছে সেই অদ্ভুত লোকটার কথা—দস্যু বনহুর এবং তার কথাগুলো।

ওদিকে স্বপন কুমার কিন্তু ঘুমাতে পারেনি, তখনও তার মনেও আলোড়ন জাগাচ্ছিলো আজ রাণী মঙ্গলা দেবীর আচরণ। তার ব্যবহারে আজ সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলো, মহারাণী যখন তার বুকে মাথা রেখে বলেছিলো, স্বপন, তুমি ছাড়া আমি আর কিছু বুঝি না। তুমি আমার যথাসর্বস্ব.....যতই কথাগুলো ভাবছে স্বপন কুমার, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে।

ওদিকে মহাদেব ভাবছে দস্যু বনহুরের কথা।

আসলে কেউ ওরা ঘুমাতে পারেনি। মহাদেব একসময় ডাকে—স্বপন দা! স্বপন দা ঘুমাচ্ছো?

স্বপন কুমার পাশ ফিরে চোখ মেলে—তুমি ঘুমাওনি মহাদেব?

না ঘুমাইনি। এসো স্বপন দা আমরা এক বিছানায় শয়ন করি।

কেন?

আমার ভয় পাচ্ছে স্বপন দা।

ভয়! ভয় কিসের মহাদেব?

এসো বলছি।

তোমার কথা শুনে যদি আমার ভয় পায়—ভূতের কথা বলবে না তো?

না না, ভূতের কথা নয়।

তবে কিসের মথা মহাদেব?

আমার বিছানায় এসো বলছি।

স্বপন কুমার শয্যা ত্যাগ করে মহাদেবের শয্যায় চলে আসে, বসে সে মহাদেবের পাশে।

মহাদেব তখন উঠে বসলো, তারপর চারদিকে তাকিয়ে বললো—স্বপন দা তুমি দরজা-জানালাগুলো খুব ভালো করে আটকে এসো। আমি তোমাকে একটা বিস্ময়কর কথা বলবো।

আগ্রহভরা গলায় বললো স্বপন কুমার—এখন কি কথা বলবে যা এতো বিস্ময়কর?

আগে দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে এসো। বললো মহাদেব।

স্বপন কুমার মহাদেবের কথামতো দরজা জানালাগুলো ভালোভাবে বন্ধ করে ফিরে এলো—বলো?

মহাদেব ফিস্ ফিস্ করে বললো—দস্যু বনহুর এসেছিলো।

মুহূর্তে স্বপন কুমারের মুখে একটা ভীত ভাব ছড়িয়ে ছিলো, ঢোক গিলে বললো—দস্যু বনহুর এসেছিলো রাজপ্রাসাদে—বলো কি?

হাঁ, শুধু আসেই নি সে আমার সঙ্গে কথাও বলেছে। আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলো আমার কক্ষের দরজায়।

সত্যি বলছো মহাদেব?

সম্পূর্ণ সত্যি স্বপন দা! সে কি বিকট ভয়ঙ্কর চেহারা!

বলো কি?

যদি তাকে দেখতে একবার?

তাহলে দস্যু বনহুরের সাধ্য ছিলো আমার হাত থেকে পালায়। মহাদেব, তুমি আমাকে না ডেকে ভুল করেছো। এবার যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে আমাকে তখনই ডাকবে।

মহাদেব হাসলো—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি সত্যি মস্ত বীর পুরুষ কিন্তু তোমার মুখে যে ভয়ের ছাপ বিদ্যমান.....

বাজে কথা বলে আমাকে অপমান করো না মহাদেব। আমি বলছি দস্যু বনহুর আর রাণী দুর্গেশ্বরীকে আমি গ্রেফতার করবোই করবো।

জানো দস্যু বনহুর কেমন?

জানি, তোমার আমার মতই একজন মানুষ।

মানুষ তো বটেই কিন্তু সে এক অদ্ভুত মানুষ। তার চেহারা বীর সৈনিকের মত; দেহে জমকালো পোশাক, মাথায় পাগড়ী, পায়ে বুট, হাতে উদ্যত রিভলভার.....

রিভলভার ছিলো তার হাতে?

হাঁ, শুধু রিভলভার নয় গুলিভরা রিভলভার—সামান্য একটা টু শব্দ করলেই মৃত্যু। স্বপন দা, জানো দস্যু বনহুর যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি কোমল। এমন লোক আর হয় না, যেন দেব পুরুষ.....

বলো কি মহাদেব, তুমি যে আমাকে একেবারে দস্যু বনহুরের গুণমুগ্ধ করে তুলছো। কিন্তু তুমি তার যতই প্রশংসা করো আমি তোকে রেহাই দেব না। পাকড়াও করে সমুচিত শাস্তি দেবোই দেবো.....

না না, সে আমার জীবনরক্ষক। বিনীত কণ্ঠে বললো মহাদেব।

অবাক কণ্ঠে বললো স্বপন কুমার—দস্যু বনহুর তোমার জীবনরক্ষক?

হাঁ স্বপন দা।

সত্যি বলছো?

সত্যি বলছি। মহাদেব গলার স্বর খাটো করে নিয়ে বললো—জানো আমার মা আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলো!

বিস্ময় ভরা অস্ফুট কণ্ঠে বললো স্বপন কুমার—এ তুমি কি বলছো মহাদেব!

শোন স্বপন দা সব সব বলছি তোমাকে।

বলো দেখি কি ব্যাপার?

মহাদেব তাকে সব কথা বলতে শুরু করে—মায়ের ঘরে যাওয়ার পর থেকে সমস্ত ঘটনা বলে যায় সে স্বপন কুমারের কাছে। অবাক কণ্ঠে বলে—মা আমাকে ঠাণ্ডা জল পান করতে দিলো, আমি বিনা দ্বিয়ায় জলটা পান করতে গেলো াম, ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে একটা পাথরের ছোট্ট টুক্‌রা এসে আমার হাতের গেলো াসের গায়ে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে গেলো াসটা আমার হাতের মধ্যে ভেঙ্গে গেলো টুকরা টুকরা হয়ে। জলগুলো গড়িয়ে পড়লো আমার জামাকাপড়ে।

মহাদেবের কথা শুনে স্বপন কুমারের চোখেমুখে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর ভাব ফুটে উঠলো বললো সে—তারপর কি হলো?

মহাদেব বলে চলে—মা আর আমি এক সঙ্গে ফিরে তাকাই—দেখতে পাই, একটা জমকালো পোশাকপরা লোক দক্ষিণ হস্তে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পিছনে। মা দস্যু বনহুরকে চেনেন, কাজেই মা বলেন—দস্যু বনহুর, তুমি! আমি তো তাকে দেখিনি কোনোদিন, হতবুদ্ধি

হয়ে গেলো াম একেবারে! দস্যু বনহুর আমাকে লক্ষ্য করে বললো—এসো মহাদেব আমার সঙ্গে এসো। পরের ঘটনাগুলো সব এক এক করে ব্যক্ত করলো মহাদেব স্বপন কুমারের নিকটে। তারপর বললো সে—স্বপন দা দস্যু বনহুর রক্ষা না করলে আজ আমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিলো।

তাতো বুঝলাম, কিন্তু.....

না, কোনো কিন্তু নয়, স্বপন দা তুমি দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতে পারবে না। আমি তাকে গ্রেফতার করতে দেবোনা তোমাকে।

হাসে স্বপন কুমার—বেশ, তোমার কথাই রইলো।

❑

আগামীকাল রাজকুমার মহাদেবের অভিষেক। মহারাজের মৃত্যুর পর রাণী মঙ্গলা দেবী স্বয়ং রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলো কিন্তু প্রজাগণ তাতে আপত্তি তুলেছিলো। কারণ রাজকুমার শিশু বা নাবালক নয়। মহাদেব এখন পূর্ণবয়স্ক, কাজেই প্রজাগণ রাজপুত্রকেই তাদের রাজা হিসাবে পেতে চায়।

মঙ্গলা দেবীর ইচ্ছা সমূলে বিনষ্ট হলো, প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি রাজ সিংহাসনে উপবেশন করতে রাজি নন।

প্রজাদের মনস্কামনা পূর্ণ আশাতেই মঙ্গলা দেবী রাজকুমার মহাদেবকে রাজসিংহাসনে বসাতে সম্মত হয়েছেন এবং তারই অভিষেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে কাল।

রাজ্যময় ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, আগামীকাল মহাদেবের অভিষেক।

রাজ্যের প্রতিটি প্রজার মনে নতুন এক আনন্দ-উৎস বইতে শুরু করেছে। রাজার মৃত্যু ঘটেছে, যাক এবার তারা রাজপুত্র মহাদেবকে রাজা হিসাবে পাবে। মহাদেব সিংহাসনে উপবেশন করার পর তিনি রাজ্যের মঙ্গলদণ্ড হাতে নেবেন এবং প্রজাদের মঙ্গল কামনা করবেন। তখন রাণী দুর্গেশ্বরী দমনেও মনোযোগী হবেন।

প্রজাদের মনে অফুরন্ত আনন্দ, রাজার মৃত্যুশোক তারা ভুলে যায় যেন সবাই বাড়িঘর আলোকমালায় সজ্জিত করে। পথঘাট সব সাজানো হয়, মন্দিরে মন্দিরে রাজপুত্রের মঙ্গল কামনায় পূজা অর্চনা শুরু হয়।

রাজপ্রাসাদ আলোকমালায় ঝলমল করছে। দাসদাসী থেকে রাজ-পরিষদগণ সবাই নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছে।

রাণী মঙ্গলা দেবীর মনের অবস্থা ভাল নয়, তবু তিনি নিজকে সামলে নিয়ে পুত্র মহাদেবের অভিষেকের আয়োজন করে চলেছেন।

কিন্তু সেদিন গভীর রাতে মহাদেব যখন কক্ষে ঘুমাচ্ছিলো তখন একদল দস্যু তার কক্ষে প্রবেশ করে এবং মহাদেব ও স্বপন কুমারকে মজবুত করে বেঁধে ফেলে।

ঘুম ভেঙ্গে যায় স্বপন কুমার এবং মহাদেবের কিন্তু তখন নড়ার কোন উপায় নেই। ঘুমের ঘোরেই তাদের হাত-পা মুখ শক্ত করে বেঁধে ফেলা হয়েছে।

স্বপন কুমার বুঝতে পারলো—তার হাত-পা শক্ত করে খাটের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়েছে। মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা, শুধু চোখ দুটো খোলা রয়েছে তাই সে দেখতে পাচ্ছে সব। স্বপন কুমার তাকালো মহাদেবের খাটের দিকে, বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখলো, কয়েকজন লোক মহাদেবকে হাত-পা-মুখ বেঁধে তুলে নিল কাঁধে তারপর বেরিয়ে গেলো । আশ্চর্য হলো স্বপন কুমার, মহাদেবকেই শুধু নিয়ে গেলো আর তাকে ছেড়ে গেলো কেন? বড় আফসোস হচ্ছে, এমন ঘুম তার কি করে পেয়েছিল? একটু যদি টের পেত তাহলে ওদের পাকড়াও না করে ছাড়তো না সে কিছুতেই। স্বপন কুমার ভাবতে থাকে—এরা কারা? দস্যু বনহুরের অনুচর না দুর্গেশ্বরীর লোক?

কিন্তু কে তাকে বলে দেবে, সবাই তখন অদৃশ্য হয়েছে। কক্ষের দরজা বন্ধ, তা'ছাড়া হাত-মা-মুখ সব বাঁধা রয়েছে মজবুত করে। চিৎকার করে কাউকে ডাকবে তারও উপায় নেই।

মনটা কিন্তু স্বপন কুমারের ছট্‌ফট্ করছে, না জানি মহাদেবকে ওরা কোথায় নিয়ে গেলো ? কি করবে ওকে নিয়ে গিয়ে।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে একসময় রাত ভোর হয়ে এলো। কোনো একজন মহাদেব ও স্বপন কুমারকে জাগাতে এসে স্তম্ভিত হতবাক হলো। মহাদেবের খাট শূন্য, স্বপন কুমারকে বন্ধন অবস্থায় পাওয়া গেলো ।

খবর শুনে রাণী মঙ্গলা দেবী ছুটে এলেন, নিজ হস্তে খুলে দিলো স্বপন কুমারের বন্ধন। মহাদেবের জন্য মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলো। আজ অভিষেক আর কিনা মহাদেব উধাও!

মন্ত্রী এবং সেনাপতির মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লোএকি বিভ্রাট ঘটলো!

কথাটা অল্পক্ষণের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়লো রাজ্যময়। প্রজাগণ হাহাকার করে উঠলো, কারণ বেশি দিনের কথা নয় মহারাজের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটেছে, তারপর এই অদ্ভুত কাণ্ড! রাজপুত্রকে কে বা কারা হরণ করে নিয়ে গেছে।

রাজ অভিষেক বন্ধ করা যায় না, মঙ্গলা দেবীই রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করবেন।

কিন্তু রাজ-পরিষদগণ এতে খুশি হলেন না, তারা বলেন আমরা রাজপুত্র মহাদেবের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে চাই। রাজ্যময় ঘোষণা করে দেওয়া হলো যে রাজপুত্র মহাদেবের সন্ধান এনে দিতে পারবে তাকে বহু অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাজ-পরিষদগণ মহাদেবের সন্ধানে যে যেদিকে পারে ছুটলো। পুলিশ মহলেও সাড়া পড়ে গেলো , তারাও অনুসন্ধান করে ফিরতে লাগলো।

মহাদেবের অন্তর্ধানে রাজ্যময় একটা অশান্তির ছায়াপাত ঘটলো। প্রজাদের মনে আতঙ্ক আর উদ্বিগ্নতা, তাদের রাজ পুত্র হঠাৎ কোথায় উধাও হলো! কে তাকে চুরি করে নিয়ে গেলো । অল্পদিন আগেই তারা দয়াবান মহারাজকে হারিয়ে শোকসাগরে ভাসছে, তারপর এই অঘটন অশুভ কাণ্ড! কাল হবে অভিষেক আর আজ রাজপুত্র নিরুদ্দেশ।

মঙ্গলা দেবীও সকলের সম্মুখে মহাদেবের শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁরই চক্রান্তে রাজকুমার মহাদেবকে অভিষেক রাত্রে রাজপ্রাসাদ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

প্রাসাদের অনেকেই স্বপন কুমারকে সন্দেহ করে বসলো। মহাদেবের নিরুদ্দেশ ব্যাপারের সঙ্গে নিশ্চয়ই জড়িত আছে সে। রাজ-পরিষদগণও এই মন্তব্য প্রকাশ করলেন।

সেনাপতি মঙ্গলা দেবীর নিকটে এসে জানালেন—মহারাণী স্বপন কুমারকে প্রাসাদের অনেকেই সন্দেহ করছেন। তারা বলছেন, মহাদেবের অন্তর্ধান ব্যাপারের সঙ্গে তিনি জড়িত আছেন।

সেনাপতির কথায় মঙ্গলা দেবী ক্রুদ্ধভাবে বলে উঠলেন—এটা তাদের অহেতুক সন্দেহ সেনাপতি। স্বপন কুমার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

রাণীর কথায় কোন প্রতিবাদ করার সাহস ছিলো না সেনাপতির, তিনি নত মস্তকে প্রস্থান করলেন রাণীমহল থেকে, কিন্তু মনে মনে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হলেন।

শুধু সেনাপতিই নয়, রাণীজীর কথায় রাজপরিষদ সবাই ক্ষুব্ধ হলেন। স্বপন কুমার গোরী রাজ্যের কেউ নয়, এখানে কোন অধিকারই নেই তাঁর। কেন সে এখানে থাকে? দস্যু বনহুর এবং দুর্গেশ্বরীকে গ্রেফতার করা তার ছলনা ছাড়া কিছু নয়।

আজকাল স্বপন কুমারের সঙ্গে রাণী মঙ্গলা দেবীর ঘনিষ্ঠতাও যেন বেড়ে গেছে চরম আকারে। সর্বক্ষণ মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারকে পাশে পাশে রাখেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা চলাকালেও স্বপন কুমার সে স্থানে উপস্থিত থাকে। এতে সেনাপতি বা মন্ত্রীবর কোন আপত্তি করতে পারে না।

মাঝে মাঝে মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারসহ বাগানবাড়িতে ভ্রমণ করেন এবং হাসিগল্প করে থাকেন। এসব ব্যাপার নিয়ে রাজপ্রাসাদে নানারকম গুঞ্জন শুরু হয়েছে কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না।

আগের চেয়ে স্বপন কুমারকে এখন কিছুটা বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। তার কথাবার্তায় যদিও ছেলেমি ভাব যথেষ্ট রয়েছে তবু রাণী তাকে অত্যন্ত সমীহ করে। রাণী মঙ্গলা দেবীর সহানুভূতিই স্বপন কুমারকে সত্যিকারের সাহসী করে গড়ে তোলে।

মঙ্গলা দেবীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রথমে বড্ড ঘাবড়ে যাচ্ছিলো স্বপন কুমার। আজকাল অনেকটা সচ্ছ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, কিন্তু একেবারে দুঃসাহসী হতে পারেনি।

মঙ্গলা দেবীর সঙ্গে কথাবার্তা, হাসিগল্প করতে তার বাঁধতো না কিন্তু যখন মঙ্গলা দেবী তার বুকে মাথা রাখতো বা তার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে আবেগভরা কণ্ঠে বলতো—স্বপন তুমি আমার স্বপ্নরাজ্যের রাজা, তুমি আমার কামনার জন, তোমাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে.....তখন কেমন যেন ঘেমে উঠতো স্বপন কুমার ভিতরে ভিতরে। আবার সরে যেতেও পারতো না। রাণী মঙ্গলা দেবীর মোহ তাকে মোহগ্রস্ত করে ফেলেছিলো।

মঙ্গলা দেবী যখন স্বপন কুমারকে নিয়ে আত্মহারা, রাজ্যময় যখন মহারাজের অভাব অশান্তির ঘনছায়া। রাজপুত্র মহাদেবের হরণ ব্যাপার নিয়ে যখন প্রজাদের মনে গভীর আশঙ্কা, তখন দস্যুরাণী দুর্গেশ্বরী রাজ্যের নিরীহ প্রজাদের বাড়িতে হানা দিয়ে তাদের যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে যেতে লাগলো, এবং যাকে পেলো হত্যা করে চললো। ভীষণ এক তাজ্জবলীলা শুরু করে নিলো সে।

পুলিশ মহল নানা চেষ্টা করেও দুর্গেশ্বরী গ্রেফতারে সক্ষম হলো না। পথে-ঘাটে-মাঠে সদা ভয় আর আশঙ্কা নিয়ে লোকজন চলাফেরা করতে লাগলো।

সন্ধ্যার পর নগর মধ্যে জনপ্রাণী চলাফেরা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। বিশেষ জরুরি কাজ না থাকলে কেউ বাড়ির বাইরে যেতো না। কিন্তু বাইরে না গিয়েই বা কি, গভীর রাতে নগরবাসী যখন আরামে একটু ঘুমিয়ে পড়তো তখন আচমকা দুর্গেশ্বরী দলবল নিয়ে হানা দিতো লুটে নিতে সমস্ত ধন-সম্পদ এবং বাড়ির দু'চারজনকেও ধরে নিয়ে যেতো, পরে পথের উপর কিংবা ময়দানের মধ্যে পাওয়া যেতো সেইসব হরণকারী জনগণের মৃতদেহ।

সমস্ত রাজ্যটা যখন চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন তখন মঙ্গলা দেবী নিজে সিংহাসনে উপবেশন করবেন এবং রাজদণ্ড হাতে নেবেন বলে ঘোষণা করলেন। প্রজাদের কোন আপত্তিই তিনি কানে নেবেন না। রাজ-পারিষদগণকে ডেকে আয়োজন করতে বললেন।

আগামী পূর্ণিমা রাতে তার অভিষেক হবে।

মহারাজের মৃত্যু ঘটেছে, মহাদেব অন্তর্ধান হয়েছে বলে রাজসিংহাসন শূন্য থাকতে পারে না। রাণী মঙ্গলা দেবী রাজ্যের মঙ্গল কামনাতেই সিংহাসনে উপবেশন করবেন।

রাজ-পারিষদগণ ভিতরে ভিতরে অনিচ্ছা পোষণ করলেও প্রকাশ্যে কেউ কোন মত প্রকাশ করলেন না। রাণী মঙ্গলা দেবীর অভিষেক আয়োজনে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

মঙ্গলা দেবীর মনে অফুরন্ত আনন্দ উৎস। এবার সে গোরী সিংহাসনের একেশ্বরী রূপে প্রতিষ্ঠা হবেন। হরিনাথপুরের রাজ পুত্র স্বপন কুমার থাকবে তাঁর পাশে। স্বপন কুমারের সৌন্দর্য তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিলো। স্বপন কুমার এখন মঙ্গলা দেবীর ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন।

মহারাণী মঙ্গলা দেবীর আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন সেনাপতি এবং মন্ত্রীবর। তাঁরা স্বপন কুমারকে রাজ্য থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

একদিন রাজদরবারে মঙ্গলা দেবী সিংহাসনের পাশের আসনে উপবেশন করে দরবার পরিচালনা করছেন। অভিষেক না হওয়া অবধি সিংহাসনে উপবেশন নিষিদ্ধ তাই তিনি এইভাবে দরবার চালনা করে থাকেন।

দরবার-কক্ষে রাজ-পারিষদ সবাই উপস্থিত রয়েছেন। মহারাজ বাসুদেবের ভক্ত প্রজাদের মধ্যেও আজ অনেকে রাজসভায় আগমন করেছে।

রাণীর পাশের আসনেই উপবিষ্ট স্বপন কুমার।

এতোগুলো লোকের সামনে স্বপন কুমার মহারাণীর পাশে নিজকে পেয়ে গৌরবান্বিত না হয়ে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলো।

মাঝে মাঝে রাণী মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারের মুখে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলো। মুখোভাবে প্রকাশ পাচ্ছিলো স্বপন কুমারের প্রতি তার গভীর অনুরাগ।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন সেনাপতি, মহারাণীকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—রাণীজী, একটা কথা আজ আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি।

বলুন সেনাপতি? বললেন মঙ্গলা দেবী।

সেনাপতির সঙ্গে রাজ-পারিষদগণের একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো। সেনাপতি বললেন—রাণীজী, প্রজাগণ আজ এক চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। মহারাজের আকস্মিক মৃত্যু, রাজপুত্র মহাদেবের অন্তর্ধানে রাজ্যময় এক শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তা জানি সেনাপতি। রাজ্যের মঙ্গল কামনাতেই আমি রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে মনস্থ করেছি—বললেন মহারাণী মঙ্গলা দেবী!

সেনাপতি পুনরায় বললেন—প্রজাগণ দুর্গেশ্বরীর নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে! প্রতিরাতে সে রাজ্যমধ্যে হানা দিয়ে লুটতরাজ এবং খুন-জখম করে যায়। অনেক প্রজাদের সে চুরি করে নিয়ে যায়, আর হত্যা করে রাজপথে কিংবা মাঠে-ঘাটে ফেলে রেখে যায়। সেকি ভীষণ মর্মান্তিক দৃশ্য!

হাঁ, দুর্গেশ্বরীর অত্যাচার দিন দিন চরম আকার ধারণ করেছে, তারপর আরও এক অয়ঙ্কর দস্যুর আবির্ভাব ঘটেছে, সে হলো দস্যু বনহুর!

এবার মন্ত্রীবর উঠে দাঁড়ালেন, তিনি বললেন—গৌরী রাজ্যে দস্যু বনহুরের আবির্ভাব যতখানি আতঙ্ক সৃষ্টি না করেছে ততখানি আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে দুর্গেশ্বরী.....

আচমকা উঠে দাঁড়ালো স্বপন কুমার—আমি কাউকেই ক্ষমা করবো না মন্ত্রীবর দস্যু বনহুর এবং রাণী দুর্গেশ্বরী দু'জনাকেই আমি পাকড়াও করে আপনাদের সম্মুখে হাজির করবো। তারপর হবে তাদের বিচার, বিচারের পর মৃত্যুদণ্ড.....

স্বপন কুমারের কথা শুনে রাজ-পারিষদগণ ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হাসলেন। কারণ তাঁরা জানে, স্বপন কুমার মুখে যত সাহসপূর্ণ উক্তিই উচ্চারণ করুন, আসলে তার ক্ষমতা এতোটুকু নেই।

দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা তো দূরের কথা, দুর্গেশ্বরী নারী হয়েই স্বপন কুমারকে কতবার নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে।

কতবার তাকে তার শয়নকক্ষে খাটের সঙ্গে হাত-পা-মুখ বেঁধে রেখে গেছে। রাণী স্বয়ং তাকে মুক্ত করে দিয়েছেন কতদিন। সেই স্বপন কুমার কিনা দুর্গেশ্বরীকে গ্রেফতার করবে শুধু দুর্গেশ্বরী নয়, দস্যু বনহুরকেও বন্দী করে রাজদরবারে হাজির করবেন, এ যেন এক হাস্যকর উক্তি। রাজ-পারিষদগণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

সেনাপতি বললেন—স্বপন কুমার, আপনার বাহাদুরী আমরা উপলব্ধি করেছি। আপনি বসুন।

সেনাপতির কথায় স্বপন কুমারের সুন্দর দীপ্ত মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো, অন্তরে অন্তরে অপমান বোধ করলো সে। আসন গ্রহণ করলো গম্ভীর ভাবে।

মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারের মুখোভাব লক্ষ্য করে ব্যথিত হলেন, তিনি চান না স্বপন কুমার কোন কারণে বিব্রত বা অপমানিত হয়।

মহারাণী আর কথা না বাড়িয়ে সেদিনের মত দরবার ভঙ্গের আদেশ দিলো। নিজেও আসন ত্যাগ করে অন্তপুরে চলে গেলেন।

স্বপন কুমারও দরবার ত্যাগ করে রাণীকে অনুসরণ করলো!

রাজ-পারিষদগণ এ-ওর মুখে তাকালেন।

❑

মঙ্গলা দেবী আপনি আমাকে ডেকেছেন? মহারাণী মঙ্গলা দেবীর কক্ষে প্রবেশ করে বললো স্বপন কুমার।

মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারকে দেখামাত্র উঠে তার হাত ধরে নিজের পাশে খাটের উপর বসালেন, তারপর বললেন—হ্যাঁ, তোমাকে ডেকেছি স্বপন!

স্বপন কুমার সঙ্কোচিতভাবে বসে পড়লো বটে কিন্তু তার চোখেমুখে ফুটে উঠলো একটা দ্বিধাভরা ভাব। নিজকে রাণীর কক্ষে এমন নির্জন যেন বড় বেখাপ্পা লাগছিলো তার কাছে।

মঙ্গলা দেবী বললেন—কেন ডেকেছি, জানো?

না তো!

শোন স্বপন?

বলুন মঙ্গলা দেবী? প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে তাকালো স্বপন কুমার মঙ্গলা দেবীর মুখে।

মঙ্গলা দেবী স্বপন কুমারের পাশে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছেন যাতে উভয়ের শরীরে উভয়ের ছোঁয়া লাগে। স্বপন কুমারের দক্ষিণ হস্তখানা মঙ্গলা দেবীর কোলের উপর রয়েছে। ইচ্ছা থাকলেও স্বপন কুমার হাতখানা সরিয়ে নিতে পারছিলো না সহজে।

মঙ্গলা দেবীর হাতখানাও তার হাতের উপর ছিলো তখন।

মঙ্গলা দেবী বললেন—স্বপন, আমি রাণী, আমার হৃদয় রাজ্যের রাজাই শুধু তুমি নও তোমাকে আমি গোরী রাজ্যের অধীশ্বর করতে চাই! বলো রাজি আছো?

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠে স্বপন কুমার—গোরী রাজ্যের অধীশ্বর হবো আমি?

হাঁ, কেন তুমি কি উপযুক্ত নও?

মঙ্গলা দেবী.....মানে আমি, আমি.....

চুপ করো, জানি তুমি রাজ্য চালনায় অপটু। তবু, তবু আমি তোমাকে গোরী রাজ্যের রাজা করবো।

আমার বাবা আছেন, মা আছেন, তাঁরা যদি অমত করে বসেন?

সে ভার আমার। আমি তাদের রাজি করাবো স্বপন, বলো তুমি রাজি আছো কিনা?

আমি.....বিব্রত মুখে তাকায় স্বপন কুমার মঙ্গলা দেবীর মুখের দিকে।

কেন ভয় পাচ্ছো নাকি? দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে চাও? রাণী দুর্গেশ্বরীকে বন্দী করতে চাও, আর এই সাহসটুকু তোমার হবে না? স্বপন, আমাকে তুমি বাঁচাও স্বপন।

মঙ্গলা দেবী!

জানো, আমি যা চেয়েছি সব পেয়েছি। ধন-রত্ন-ঐশ্বর্য,রাজ্য, রাজ-সিংহাসন সব পেয়েছি—শুধু পাইনি একটি জিনিস, স্বামীর প্রেম-ভালবাসা.....

স্বপন কুমার হঠাৎ বলে বসলো—শুনেছি এবং দেখেছিও বৃদ্ধ রাজা আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন।

মিথ্যা নয় স্বপন, মহারাজা আমাকে ভালবাসতেন কিন্তু সে ভালবাসা ছিলো প্রাণহীন। যার মধ্যে ছিলো না কোন অনুভূতি। স্বপন, তোমার পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠস্বর, তোমার বলিষ্ঠ সুঠাম চেহারা, তোমার ঐ গভীর নীল দু'টি চোখ আমাকে সব দিতে পারে। ধনরত্ন-ঐশ্বর্য, রাজ্য, রাজসিংহাসন যা দিতে পারেনি তাই, দিতে পারো তুমি.....

মঙ্গলা দেবী আমাকে আজ ক্ষমা করবেন, আমি চিন্তা করে সব বলবো।

না, আজ তোমাকে কথা দিতে হবে স্বপন। আমাকে স্পর্শ করে শপথ করতে হবে। বলো, আমাকে স্পর্শ করে বলো তুমি আমাকে ফেলে আর যাবে না?

শপথ করলাম, যাবো না। কিন্তু আজ আমাকে ভাবার সময় দিন।

বেশ, যাও। কিন্তু মনে রেখো, আমি তোমার.....

দেবী! আনন্দসূচক শব্দ করে স্বপন কুমার।

মঙ্গলা দেবীর চোখ দুটো মুদে আসে গভীর আবেশে, অস্ফুট আবেগভরা কণ্ঠে বলেন—স্বপন, আর একবার দেবী বলে ডাকো! আর একবার ডাকো! অমৃত না সুধা তোমার কণ্ঠে? জানি না, তোমার গলার স্বর আমার এত ভালো লাগে কেন?

স্বপন কুমার ডাকে আবার—দেবী, চলি আজ?

এসো! এসো স্বপন!

স্বপন কুমার বেরিয়ে যায়।

মহারাণী শয্যায় গা এলিয়ে দেন। কতকথা, কতছবি ভাসে তাঁর মানসপটে। স্বপন কুমার তাঁর স্বপন তাঁর সবকিছু।

তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়েন রাণী মঙ্গলা দেবী।

❑

আগামীকাল পূর্ণিমা।

মহারাণী মঙ্গলা দেবীর অভিষেকপর্ব অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যময় সাড়া পড়ে গেছে, যদিও প্রজাগণ সচ্ছ মনে রাণীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না তবু তাদের প্রস্তুত হতে হচ্ছে হাসিমুখে। যে প্রজা এ ব্যাপার নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বা কোনরকম প্রতিবাদ জানিয়েছে তাকেই বন্দী করে আনা হয়েছে রাজদরবারে। বিচারে তার কারাদণ্ড নয়, দ্বীপান্তর দেওয়া হচ্ছে।

কাজেই প্রজাগণ মনোভাব গোপন রেখে অভিষেক-উৎসব পালন করে চলেছে।

সমস্ত রাজপ্রাসাদ আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছে। মণিমুক্তাখচিত সিংহাসনটা নানারকম সুন্দর ফুলে ফুলে সাজানো হয়েছে।

প্রাসাদময় আনন্দ-উৎসব বয়ে চলেছে। রাজপারিষদগণ গোপনে নানারকম আলাপ-আলোচনা করলেও সাক্ষাতে তাঁরা মহারাণীর অভিষেকপর্ব সুন্দরভাবে যাতে অনুষ্ঠিত হয়, এ চেষ্টাই করে চলেছেন।

কিন্তু সকলের মনেই স্বপন কুমারকে নিয়ে একটা গভীর রহস্যজাল ছড়িয়ে পড়েছে। তারা কিছুতেই যেন তাকে রাজপ্রাসাদে মেনে নিতে চাইছেন না।

হরিনাথপুরের রাজকুমার কেন তাদের সঙ্গে থাকবে? কি অধিকার আছে তার এখানে চিরদিন থাকার? বিশেষ করে মহাদেবের অন্তর্ধানের পর থেকে বিষদৃষ্টি নিয়ে দেখতে শুরু করেছে স্বপন কুমারকে।

স্বপন কুমার অবশ্য রাণীকে অনেকবার জানিয়েছে, এখানে থাকতে তার মন আর চাইছে না কারণ সবাই চায় তাকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু রাণী কিছুতেই স্বপন কুমারকে বিদায় দিতে রাজি নন!

কাজেই স্বপন কুমার কতকটা বাধ্যও হয়েছে এ ব্যাপারে। মহারাণী মঙ্গলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে পারেনি হরিনাথপুরে ফিরে যেতে।

❑

রাণী মঙ্গলা যখন স্বপন কুমারকে নিয়ে স্বপ্নসৌধ গড়ার আয়োজনে ব্যস্ত তখন দস্যু বনহুরের আস্তানায় মহারাজা বাসুদেব দুশ্চিন্তা আর অশান্তিতে কাল কাটাচ্ছেন। তিনি পৃথিবীর বুকে জীবিত থেকেও আজ মৃত। তাঁর প্রজাগণ জানে, তাদের মহারাজ আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না। যদিও দস্যু বনহুরের আস্তানায় তাঁর কোন অসুবিধা হচ্ছে না—দুগ্ধফেননিভ শয্যা, সুস্বাদু ফলমূল, সুগন্ধি পনির সবকিছুই বনহুর মহারাজের জন্য ব্যবস্থা করেছিলো। কিন্তু এত করেও মহারাজের মনের চিন্তা দূর করতে পারেনি।

সেদিন শ্রাদ্ধ-শান্তি হতে ফিরে আসার পর মহারাজা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছেন। খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন তিনি। সবসময় গভীরভাবে চিন্তা করেন।

দস্যু বনহুর মাঝে মাঝে আসে মহারাজের নিকটে, সান্ত্বনা দেয় সে তাঁর পাশে বসে।

রাণী মঙ্গলা দেবীর অভিষেকের সংবাদ দস্যু বনহুর জানার পরও মহারাজের নিকটে গোপন রেখেছিলো কিন্তু আজ আর সে চেপে রাখতে পারলো না। মহারাজের কক্ষে প্রবেশ করে ডাকলো বনহুর—মহারাজ!

চমকে উঠলেন মহারাজ বাসুদেব কারণ তিনি তখন অন্যমনস্ক ছিলো। দস্যু বনহুরকে দেখেই সোজা হয়ে বসলেন। তাকালেন সম্মুখে, মহারাজের দৃষ্টি ছিলো দস্যু বনহুরের ভারী বুট দু'খানার দিকে, তারপর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হলো তার মুখে।

বনহুর পাশের আসনে বসে পড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললো—মহারাজ, আজ আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

না না, আমি আর রাজ্যে যাবো না। আমাকে তুমি এ দৃশ্য দেখতে নিয়ো যেও না বনহুর।

রাজ্যে নয়.....

তবে কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে তুমি?

রাণী দুর্গেশ্বরীর ওখানে।

রাণী দুর্গেশ্বরী! এ তুমি কি বলছো বনহুর?

হাঁ, আজ রাতে আমি দুর্গেশ্বরীর আস্তানায় হানা দেবো।

ঢোক গিলে বলেন মহারাজ—তা আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে কি করবো বলো?

আমার সঙ্গে থাকবেন, দল আরও ভারী হবে।

এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে তুমি.....না না, আমাকে ক্ষমা করো বনহুর।

না, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে। মহারাজ, আপনি তৈরি থাকবেন।

বনহুর একটু থামলো তারপর আবার বললো—আরও একটি ঘটনা ঘটে গেছে মহারাজ, যা আপনাকে আমি জানাইনি অথচ আপনার জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ঘটনা! কি ঘটনা ঘটেছে? আর কিই বা ঘটতে পারে? আমার জীবন থেকে সব আশা-ভরসা মুছে গেছে বনহুর, সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। যার স্ত্রী ব্যভিচারিণী, যার স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করতে পারে সে পৃথিবীর বুকে একটা নিকৃষ্ট পশুর চেয়েও অধম। আমার জীবনে কি এমন থাকতে পারে?

মহারাজ, আপনার প্রিয় পুত্র মহাদেব নিরুদ্দেশ হয়েছে।

মহারাজ বাসুদেব বনহুরের কথাটা শোনামাত্র অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন—আমার মহাদেব নিরুদ্দেশ হয়েছে? রাজ্য থেকে সে চলে গেছে?

না মহারাজ, তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে!

মহারাজ উন্মাদের মত বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরলেন—কে কে মহাদেবকে রাজ্যে থেকে সরিয়ে দিয়েছে? কোন্ নরাধম, কোন পাষণ্ড সে?

শান্ত হন মহারাজ!

না না, আমি শান্ত হতে পারবো না, আমার মহাদেবকে কেউ হত্যা করে ফেলেনি তো?

মহারাজ, আপনার মহাদেব জীবিত আছে।

সত্যি! সত্যি বলছো বনহুর?

হাঁ মহারাজ। কিন্তু তার আয়ু আজ রাত পর্যন্তই আছে। কাল ভোর হবার পূর্বে তাকে হত্যা করা হবে।

বনহুর!

মহারাজ, তাকে যেন হত্যা করা না হয় সে চেষ্টা করতে হবে।

বনহুর, বন্ধু আমার, তুমি নদী গর্ভ হতে আমাকে উদ্ধার করে আমার জীবন রক্ষা করেছো। প্রাণদান করেছো তুমি।

সবই ঐ দয়াময়ের ইচ্ছা মহারাজ।

হাঁ, তা জানি কিন্তু তুমি যে দেবতার চেয়েও বড়। অনেক বড়, মহান তুমি.....

থাক্, ওসব বলতে হবে না; আমি কথা দিলাম আপনার পুত্র মহাদেবকেও মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করে নেবো।

উচ্ছ্বসিতভাবে মহারাজ বাসুদেব বনহুরের হাত দু'খানা চেপে ধরলেন—বন্ধু, চিরদিন আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বেশ, তাহলে আপনি প্রস্তুত থাকবেন, আজ রাতে আমাদের সংগে যেতে হবে আপনাকে। কথাটা বলে তখনকার মতো বেরিয়ে গেলো বনহুর।

❑

অনেক রাত।

জ্যোছনা ভরা আকাশ।

গোরী পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় জ্যোছনার আলো ঝলমল করছে। চারদিকে যেন শুধু আলোর বন্যা। ধূসর পৃথিবী যেন তার প্রাণ খুলে হাসছে।

দস্যু বনহুরের দল সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। গোরী পর্বতের পিছল পথ বেয়ে পিঁপড়ের সারির মতই লাগছে। নিস্তব্ধ পর্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি হচ্ছে শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ।

সর্বাগ্রে দস্যু বনহুর।

তার ঠিক পেছনে মহারাজ বাসুদেব অশ্বপৃষ্ঠে রয়েছেন। রহমান এবং অন্যান্য অনুচর সবাই চলেছে সশস্ত্র বেশে। শরীরে জমকালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী, পায়ে হাঁটু অবধি ভারী বুট, কোমরের বেল্টে গুলিভরা রিভলভার, পিঠের সঙ্গে বাঁধা রাইফেল।

প্রতিটি দস্যুর মুখের নিচ অংশ পাগড়ীর শেষ ভাগ দিয়ে ঢাকা। জ্যোছনার আলোতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিলো ওদের।

বহুক্ষণ চলার পর বনহুরের ইংগিতে অশ্বের গতিবেগ কমিয়ে নেওয়া হলো। কারণ এখন তাদের অশ্বখুরের শব্দ যেন দূরে না গিয়ে পৌঁছে।

বনহুর জ্যোছনার আলোতে ফিরে তাকালো মহারাজ বাসুদেবের মুখে, বললো—মহারাজ, আপনার কোনো কষ্ট হচ্ছে কি?

মহারাজের দেহেও ছিলো দস্যু-ড্রেস। জমকালো পোশাক, মাথায় পাগড়ী, পায়ে ভারী বুট। পাগড়ীর শেষ অংশ দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। মহারাজকে চেনার উপায় কোনো ছিলো না। এসব পোশাক পরে তিনি কোনো দিনই অভ্যস্ত নন কাজেই অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করলেও বনহুরের কথায় বললেন—না, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

পারবেন এভাবে আরও কয়েক মাইল যেতে?

পারবো?

এরপর যে পথে আমরা চলবো তা আরও দুর্গম। এক পাশে গভীর খাদ, অন্য পাশে সুউচ্চ গোরী পর্বত। যদি কোনোক্রমে অশ্বের পা একবার পিছলে যায় তাহলে হাজার হাজার ফিট নিচে পাথরের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে মৃত্যু। মহারাজ, আপনি সাবধানে অশ্বচালনা করবেন।

কথাগুলো মহারাজকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর।

মহারাজ বাসুদেব অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠলেও মুখে সাহস টেনে বললেন—আমি সাবধানে অশ্বচালনা করবো বনহুর। আমার মহাদেবকে দেখার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমি মরতে চাই না।

❑

আলখেল্লায় আচ্ছাদিত দেহে রাণী দুর্গেশ্বরী দণ্ডায়মান তার সুইচ্চ আসনের পাশে। দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণধার ছোরা। আলখেল্লার মধ্যে চোখ দুটো যেন তার জ্বলছে।

সম্মুখে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে গোরী রাজ্যের রাজকুমার মহাদেব। সমস্ত দেহে তার কষাঘাতের চিহ্ন। চামড়া কেটে ঘা হয়ে গেছে স্থানে স্থানে। চোখ দুটো বসে গেছে, চোয়ালটা উঁচু হয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। রুক্ষ চুল, ছিন্নছিন্ন বসন।

তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গেশ্বরীর অনুচরগণ। প্রত্যেকের হস্তেই সুতীক্ষ্ণধার অস্ত্র। এক-একজনের চেহারা ঠিক জীবন্ত শয়তানের মত।

দুর্গেশ্বরী সুউচ্চ স্থান হতে ছোরাখানা নিক্ষেপ করলো মহাদেবের পার্শ্বস্থ অনুচরটির হাতে।

সে যেন এই ছোরাখানার প্রতীক্ষাতেই ছিলো। দুর্গেশ্বরী ছোরাখানা নিক্ষেপ করতেই লোকটা খপ্ করে ছোরার বাট ধরে ফেললো। চোখ দুটো জ্বলে উঠলো ভয়ঙ্কর চেহারার অনুচরটির, সে ছোরাখানা বাগিয়ে ধরলো।

দুর্গেশ্বরীর দিকে তাকালো অনুচরটি।

শিউরে উঠলো মহাদেব, ছাই-এর মত বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল।

দুর্গেশ্বরী ইংগিত করতেই লোকটা ছোরাখানা বসিয়ে দিতে গেলো মহাদেবের বুকে....ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা গুলির শব্দ হলো।

চমকে উঠলো দুর্গেশ্বরীর আস্তানার সবাই।

বিস্মিত স্তম্ভিত হলো দুর্গেশ্বরী।

যে লোকটা মহাদেবের বুকে ছোরা বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিলো সে তীব্র আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো মেঝেটা।

সম্মুখে দৃষ্টি তুলে ধরতেই সকলে দেখলো—দস্যু বনহুর দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে তার অনুচরগণ। প্রত্যেকেরই হস্তে আগ্নেয় অস্ত্র, সবাই অস্ত্র উদ্যত করে আছে।

মুহূর্তে দুর্গেশ্বরী এবং তার অনুচরবর্গের মুখে একটা গভীর ভাবের ছায়াপাত ঘটলো। অনুচরগণ তাকালো দুর্গেশ্বরীর মুখের দিকে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠলো—একজন নড়েছো কি মরেছো। কাউকে আমি রেহাই দেবো না। কথা কয়টা বলে বনহুর অনুচরদের ইংগিত করলো দুর্গেশ্বরীর অনুচরদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে।

আদেশ পাওয়া মাত্র বনহুরের অনুচরগণ দুর্গেশ্বরীর প্রত্যেকটা অনুচরের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিলো।

বনহুর রিভলভার উদ্যত করে এগিয়ে গেলো দুর্গেশ্বরীর দিকে।

দুর্গেশ্বরী তখনও তার সুউচ্চ স্থান হতে একটুও নড়েনি। আলখেল্লার মধ্যে চোখ দুটো যেন আগুন ছড়াচ্ছে। বনহুরকে এগিয়ে আসতে দেখে দুর্গেশ্বরী প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুরের মুখের অর্ধেক অংশ তার কালো পাগড়ীর শেষভাগ দিয়ে ঢাকা ছিলো শুধু চোখ দুটো এবং ভ্রু জোড়া ও নাকের কিছু অংশ পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

বনহুর দুর্গেশ্বরীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, মহারাজ বাসুদেবকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—এখানে আসুন।

জমকালো পোশাক পরা, পাগড়ীর শেষ অংশ দিয়ে মুখের অর্ধেক ঢাকা মহারাজ বাসুদেব এসে দাঁড়ালেন দস্যু বনহুরের পাশে। যদিও তিনি নিজ পুত্র মহাদেবের নির্মম করুণ অবস্থা দেখে একেবারে মুষড়ে পড়ছিলো তবুও নিজকে সংযত রাখতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ দস্যু বনহুর তাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলো। সেখানে গিয়ে কোনো চরম অবস্থার সম্মুখীন হলেও আপনি নিজকে যেন প্রকাশ করবেন না।

বনহুরের কথাটা ফেলতে সাহস করেননি মহারাজ বাসুদেব। অতি কষ্টে নিজকে তিনি শক্ত করে রেখেছেন, যদিও মহাদেবের অবস্থা তাঁকে একেবারে উত্তেজিত করে তুলেছিলো।

বনহুরের নির্দেশে মহাদেবের হাত-পা এবং মুখের বন্ধন উন্মোচন করে দেওয়া হলো।

অন্যান্য অনুচর দুর্গেশ্বরীর প্রত্যেকটা অনুচরকে পিঠ-মোড়া করে বেঁধে ফেললো। কারো নড়ার জো রইলো না।

বনহুর তখন দুর্গেশ্বরীর বুকে রিভলভার চেপে ধরে আছে।

আলখেল্লার মধ্যে দুর্গেশ্বরীর চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। এই মুহূর্তে তার হাতে যদি কোন অস্ত্র থাকতো তাহলে সে বনহুরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দুর্গেশ্বরীর চোখের সম্মুখে তার অনুচরগণের চরম অবস্থা দেখে সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিলো না। রুখে উঠার জন্য সিংহীর ন্যায় ফোঁস ফোঁস করছিলো।

বনহুর তাকে সে সুযোগ দিলো না, আলখেল্লাসহ দুর্গেশ্বরীকে বেঁধে ফেলার নির্দেশ দিলো।

অত্যন্ত বুদ্ধিবলে এবং কৌশলে দস্যু বনহুর ভয়ঙ্করী দস্যু রাণী দুর্গেশ্বরীকে বন্দী করে কাবু করলো। শুধু দুর্গেশ্বরীই নয়, তার অনুচরগণ সবাই বন্দী হলো।

বনহুর দুর্গেশ্বরীর অনুচরগণকে একটা গুহায় আটক করে গুহার মুখে পাথরচাপা দিল, তারপর হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে। হাসি থামিয়ে ফিরে তাকালো দুর্গেশ্বরীর দিকে—রাণী দুর্গেশ্বরী, তোমার অনুচরগণ এই বদ্ধ গুহায় তোমার আসার প্রতীক্ষা করবে।

দুর্গেশ্বরী আলখেল্লার মধ্যে অধর দংশন করলো—সে জানে তার অনুচগরণ অল্পক্ষণের মধ্যেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, কারণ গুহাটার কোন ছিদ্রপথ ছিলো না।

বনহুর এবার তার অনুচরগণসহ রহমানকে চলে যাবার জন্য আদেশ করলো।

রহমান সর্দারকে কুর্নিশ জানিয়ে দলবল নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো।

বনহুর এবার দুর্গেশ্বরীকে লক্ষ্য করে বললো—দুর্গেশ্বরী তোমার বিচার করবেন মহারাজা বাসুদেব।

আলখেল্লার মধ্যে চমকে উঠলো দুর্গেশ্বরী।

বনহুর মহারাজ বাসুদেব ও দুর্গেশ্বরীসহ রাজদরবারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। সঙ্গে মহাদেবও রয়েছে।

সম্মুখস্থ অশ্বপৃষ্ঠে মহারাজ বাসুদেব, তাঁর দেহে এখনও দস্যু-ড্রেস। মুখের নিচের অংশ ঢাকা থাকায় তাঁর মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে না। তাঁর পিছনের অশ্বে রাজপুত্র মহাদেব চলছে।

মাঝের অশ্বে রাণী দুর্গেশ্বরী তার দেহে আলখেল্লা হাতে এবং মাজায় লৌহ শিকল বাঁধা রয়েছে। অশ্বপৃষ্ঠে আরষ্টভাবে বসে আছে সে।

পিছনের অশ্বপৃষ্ঠে স্বয়ং দস্যু বনহুর। তাঁর দক্ষিণ হস্তে গুলিভরা রিভলভার। জমকালো ড্রেস পরিহিত এই তিনজনকে জ্যোছনা ভরা রাতে বড় অদ্ভুত লাগছিলো। মহাদেব মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলো তাদের দিকে।

অভিষেকপর্ব শুরু হবার পূর্ব মুহূর্তে রাজদরবারে সবাই উপস্থিত হয়েছেন। নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট সবাই। মন্ত্রীবর, সেনাপতি এবং রাজ -পারিষদ সবাই রয়েছেন। অভিষেক করবেন রাজগুরু তিনি এসেছেন রাজদরবারে।

শুধু আসেননি মহারাণী মঙ্গলা দেবী এবং স্বপন কুমার। তাঁদের প্রতীক্ষায় সবাই প্রহর গুণছেন।

ঠিক ঐ মুহূর্তে দরবারকক্ষে প্রবেশ করে জমকালো ড্রেস পরিহিত মহারাজ বাসুদেব এবং দস্যু বনহুর এবং লৌহশিকল বাঁধা অবস্থায় রাণী দুর্গেশ্বরী ও মহাদেব।

দরবারকক্ষের সবাই বিস্মিত হয়ে তাকালো। কেউ কোনো প্রশ্ন করার পূর্বেই বলে উঠলো বনহুর—আপনারা আমাদের দেখে অবাক হয়েছেন বুঝতে পেরেছি। আর অবাক হয়েছেন মহাদেবকে দেখে। স্বপন কুমার আপনাদের কাছে কথা দিয়ে ছিলো সে আজ দস্যু বনহুর এবং দুর্গেশ্বরীকে পাকড়াও করে আপনাদের সম্মুখে হাজির করবে। দস্যু বনহুর ও দুর্গেশ্বরী আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছে।

দরবারকক্ষে যেন বাজ পড়লো, সবাই বিস্ময়ভরা নয়নে তাকালো পাশের জমকালো পোশাকপরা দেহগুলোর দিকে। বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে দরবারকক্ষস্থ সকলের মুখমণ্ডল। একি তারা স্বপ্ন দেখছে! সত্যি কি তাদের সম্মুখের দস্যু বনহুর আর দুর্গেশ্বরী উপস্থিত? আলখেল্লা-ঢাকা নারীমূর্তিই যে দুর্গেশ্বরী এটা তারা বুঝতে পারে, কিন্তু দস্যু বনহুর কে? কারণ দু'জনার দেহে ছিলো একই রকম ড্রেস-মহারাজ এবং দস্যু বনহুরের।

উপস্থিত সবাই মহাদেবের আবির্ভাবে একেবারে যেন বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা রাণী দুর্গেশ্বরী এবং দস্যু বনহুর সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে নির্বাক হতভম্ব দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে তারা।

বনহুর বললো এবার—শুধু দস্যু বনহুর আর দুর্গেশ্বরীকেই আজ পাকড়াও করে আনিনি, মহারাজ বাসুদেবকেও স্বর্গ থেকে উদ্ধার করে এনেছি---

একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠলো দরবারকক্ষ মধ্যে মহারাজ জীবিত—একি শুনছি আমরা---একি শুনছি---

বললো বনহুর —হাঁ, আপনাদের মহারাজ আজ স্বয়ং রাণী দুর্গেশ্বরীর বিচার করবেন।

বনহুরের কথায় দরবার কক্ষের সকলের মুখমণ্ডলে রাজ্যের বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

সেনাপতি উঠে দাঁড়ালেন, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—কে তুমি? স্বর্গীয় মহারাজের সম্বন্ধে যা তা বলছো? জানো এর শাস্তি দেবো আমরা।

জানি কিন্তু আমার কথা মিথ্যা নয়। এই মুহূর্তেই আপনারা বিশ্বাস করবেন আপনাদের মহারাজ জীবিত। বনহুর মহারাজের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের কাল পাগড়ীর আঁচল খুলে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে দরবারকক্ষের সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলো—মহারাজ! মহারাজ জীবিত রয়েছেন---জয়! ভগবানের জয়---জয়! ভগবানের জয়---

মন্ত্রীবর এবং সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়েছিলো, তাদের সঙ্গে দরবারকক্ষের সবাই মহারাজের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো।

মহাদেব পিতাকে দেখামাত্র আনন্দসূচক শব্দ করে ছুটে গিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরলো—বাবা, বাবা তুমি বেঁচে আছো! বাবা, আমার বাবা---

মহাদেব এতোক্ষণ জানতো না তার পিতা তাদের সঙ্গেই রয়েছেন। সে ভেবেছিলো ওরা উভয়েই দস্যুদলের লোক। যে মুহূর্ত বনহুর মহারাজের মুখের আবরণ খুলে ফেলেছিলো তখন মহাদেব পিতাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে ছিলো, তাই সে ছুটে গিয়ে পিতাকে জাপটে ধরলো।

পিতা-পুত্রের মিলন হলো।

রাজগুরু এসেছিলো মঙ্গলা দেবীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করতে, আজ তারই অভিষেক। কিন্তু মহারাণী মঙ্গলাদেবী কোথায়?

দস্যু বনহুর রাজগুরুকে লক্ষ্য করে বললো—রাজগুরু, আপনি মহারাজ বাসুদেবকে তাঁর সিংহাসনে আজ নতুন করে আবার প্রতিষ্ঠা করুন।

মহারাজ বাসুদেব সিংহাসনে উপবেশন করলেন।

রাজগুরু তাঁকে আশীর্বাদ করলেন—জয়! মহারাজ বাসুদেবের জয়! জয়! ভগবানের জয়--

আলখেল্লার মধ্যে দুর্গেশ্বরীর চোখ বিস্ময়ে গোলাকার হয়ে উঠেছে, মহারাজ বাসুদেব জীবিত। একি কথা! তাঁর যে মৃত্যু ঘটেছিলো।

বনহুর দুর্গেশ্বরীর পাশে গিয়ে বললো—এবার আমি দুর্গেশ্বরীর পরিচয় আপনাদের জানাবো।

দরবারকক্ষের সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে দুর্গেশ্বরীর দিকে তাকালো, সকলের মনে ভয়-ভীতি আর আশঙ্কা—এই আলখেল্লার নিচে না জানি কি রূপ ঢাকা আছে, যার ভয়ে তারা সদা-সর্বদা তটস্থ থাকতো। কে এই নরহত্যাকারিণী?

বনহুর একটানে খুলে ফেললো দুর্গেশ্বরীর মুখের আবরণ।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষমধ্যে যমদূত দেখার মত চমকে উঠলো সবাই। কারো মুখে কোন কথা নেই, সবাই যেন পাথরের মূর্তির মত জমে গেছে একেবারে।

পরবর্তী বই
দুর্গেশ্বরীর জীবন্ত সমাধি

ঐই সিরিজের পরবর্তী বই